২০০১

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ❑ ৪র্থ সংখ্যা

৩১ আগস্ট, ২০০১ ঈসাব্দ

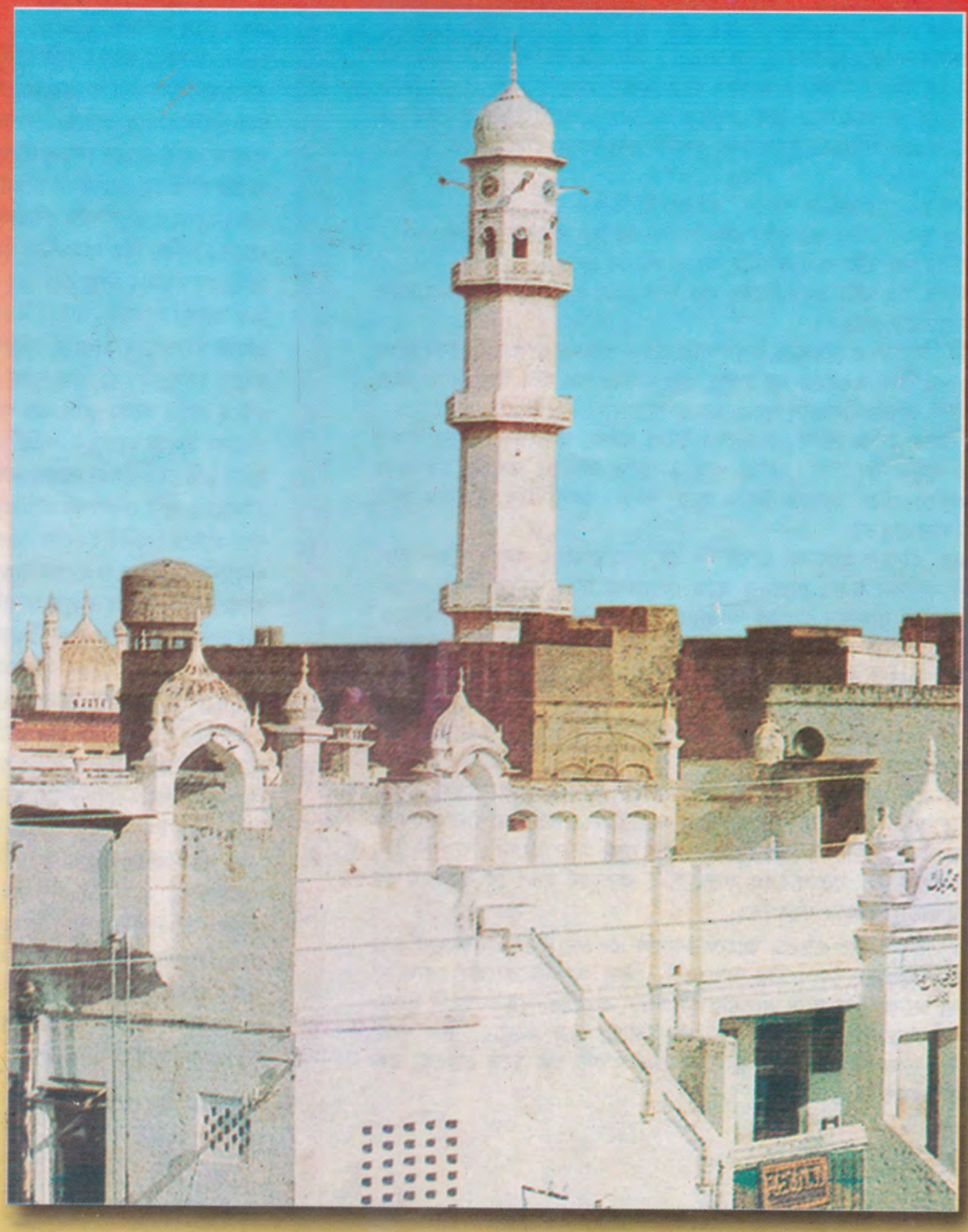

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের ঊর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আন্তর্জাতিক সালানা জলসা ২০০১ জার্মানীর ম্যানহেইমে অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি ২৪, ২৫ ও ২৬শে আগষ্ট ২০০১ইং তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আন্তর্জাতিক বার্ষিক জলসা (সম্মেলন) জার্মানীর ম্যানহেইমে সুবিশাল মার্কিতে (প্যান্ডেল) বসা মেহমানগণ যেমন প্রত্যক্ষভাবে দর্শন ও শ্রবণ করেছেন– তেমনি বিশ্বব্যাপী ৫টি মহাদেশের কোটি কোটি মানুষ তা MTA-স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মাধ্যমে একই সাথে উপভোগ করেছেন।

যোগাযোগের এ ঔৎকর্ষ আজ পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মানুষের মধ্যে ব্যবধানকে কমিয়ে এনেছে। খেলাফতের মাধ্যমে একই নেতার নেতৃত্ব দানের বিষয়কে আল্লাহ্ সহজতর করেছেন। আমরা আহমদীয়তকে কবুল করে সৌভাগ্যবান হয়েছি। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান নেতা সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) বিশ্ববাসীর প্রতিটি গৃহাভ্যন্তরে আল্লাহ্‌র তৌহীদ এবং হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সুন্নত ও আদর্শ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে MTA-এর অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ৮টি (বাংলাসহ) ভাষায় আজ MTA-ইসলামের বাণী ও সৌন্দর্য অহোরাত্র সম্প্রচার করে চলেছে। পৃথিবীর কোন কোন দেশ আহমদীদের প্রচার ও প্রসারে বাধা সৃষ্টি করছে– কিন্তু আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন MTA-এর বদৌলতে সে বাধাকে দূরীভূত করে দিয়েছেন। আহমদীয়তের অগ্রযাত্রা আজ অপ্রতিরোধ্য। জার্মানীর ম্যান- হেইমে প্রায় ৫০ হাজার নর-নারী একত্রিত হয়েছেন। সম্মেলন মার্কির বাইরে পৃথিবীর শতাধিক দেশের পতাকা উড়েছে। সূরা তাকবীরের বাণী– **ওয়া ইযান্ নুফুসু যুভিজাত** অর্থাৎ 'এবং যখন বিভিন্ন জাতীর লোকদিগকে একত্রিত করা হবে' উক্ত বাণী পূর্ণ করে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ সম্মেলন। কি অপূর্ব দৃশ্য– কোন বিশৃংখলা নেই– কোন চীৎকার নেই– আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য জার্মান পুলিশের কোন ব্যস্ততা নেই। আলহামদুলিল্লাহ্ আলা যালেক।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা

১৬ ভদ্র ১৪০৮ বঙ্গাব্দ ১১ জমাদিউস সানী ১৪২২ হিঃ কাঃ
৩১ যহূর ১৩৮০ হিঃ শাঃ ৩১ আগস্ট ২০০১ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মোঃ আবুল কালাম আজাদ

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	–	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫

E-mail : amgb@ bol-online.com

সম্পাদকীয়

জলসা সালানা-আহমদীয়তের সত্যতার নিদর্শন

এমনিতেই আহমদীয়তের সত্যতার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু জলসা সালানা আহমদীয়তের সত্যতার এমন একটি বাস্তব ও আন্তর্জাতিক নিদর্শন যা কোন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারেন না। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আহমদীয়তের৭৫ জন বিদগ্ধ মহান ব্যক্তিদের নিয়ে কাদিয়ানের ক্ষুদ্র অচেনা অজানা পল্লী থেকে যার অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিলো তা এখন শুধু জলসা গাহে হাজার হাজার উপস্থিত পাগল পারা আহমদীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, MTA-এর বদৌলতে সারা বিশ্বের ১৭৬ টি দেশের কোটি কোটি লোকের পিপাসার্ত হৃদয়কে অমৃত সুধা বিতরণে সঞ্জীবিত ও বিমোহিত করে চলেছে।

গত সপ্তাহে জার্মানীর মেইনহেইম স্থানে আহমদী জামাতের আন্তর্জাতিক সালানা জলসা হয়ে গেলো। এতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও রং-এর ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রায় অর্ধলক্ষ দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত হয়েছিলেন। সালানা জলসার এ যে মনোহারী রূপ তা আচমকা কোন ঘটনা নয়। এ প্রসঙ্গে যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালামের কাছে আল্লাহ্তাআলা আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে ইলহামের মাধ্যমে শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন ঃ **ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন 'আমীক ইয়াতূনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন 'আমীক** অর্থাৎ যদিও এখন তুমি একা কিন্তু তোমার নিকট এমন যুগও আসবে যখন তুমি একা থাকবে না। দলে দলে লোক দূর দূর দেশ থেকে তোমার নিকট আসবে। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণী বড়ই শান ও শওকতের সাথে পূর্ণ হয়ে চলেছে। বিরুদ্ধবাদীদের দিনরাতের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও আর সর্বপ্রকার মিথ্যারোপ ও চক্রান্ত সত্ত্বেও খোদাতাআলা এ জামাতকে বাড়িয়ে চলেছেন। উল্লেখ্য, বিগত বছরে সারা বিশ্বে ৮ কোটি ১০ লক্ষেরও অধিক লোক এ জামাতে বয়াত করেছেন। জামাত একদিকে দিন দিন জাঁকজমকের সাথে অগ্রসর হচ্ছে অপর দিকে এর বিরোধিরা নাস্তানাবুদ হয়ে চলেছে সর্বক্ষেত্রে। কাদিয়ানের বাইরে যে লোককে কেউ চিনতো না জানতো না ঐশী সুসংবাদসমূহ যথাসময়ে তাঁকে এতই ইজ্জত ও সম্মান দিয়েছে যে, কেবল হিন্দুস্তানেই নয় বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশের ১৭৬ টি রাষ্ট্রের কোণে কোণে পর্যন্ত তার নাম ডাক ছড়িয়ে পড়ছে। সুতরাং তিনি বলেন, "*আমার নিকট তো এ নিদর্শনই যথেষ্ট যে, এত লোক এখানে আসে, তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি এক একটি নিদর্শন আর খোদাতাআলা এদের সকলকে আগেই খবর দিয়ে রেখেছেন আর এসব সাহায্য ও সমর্থন যা কিনা আমাদের সঙ্গ দিচ্ছে আল্লাহ্তাআলা এসব ব্যাপারে আগেই আমাদের সাথে অঙ্গীকার করে রেখেছেন। কিন্তু যে মিথ্যাবাদী ও আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনাকারী হয়ে থাকে তাকে খোদা কখনও সাহায্য করেন না। বরং উল্টো ধ্বংস করে দেন*" (মলফূযাত, পঞ্চম খন্ড, নতুন ছাপা পৃষ্ঠা ৩৭৭-৩৭৮)।

তিনি (আঃ) আরও বলেন, বরাহীনে লেখা রয়েছে **"ইয়াতূনা মিন কুলি ফাজ্জিন 'আমীক ওয়া ইয়াতীকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন 'আমীক'** যদি এ নিদর্শনকে প্রত্যক্ষ করা যায় তাহলে স্বীয় স্থানে ইহা দশ লক্ষ নিদর্শনের সমান হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি নবাগত অতিথি তিনি এ নিদর্শনকে পুরো করেন। এবং বিভিন্ন অঞ্চল ও স্থান থেকে চিঠি পত্র আসছে। উপহার আসছে ... **তাহলে পরে ইহা কি সাধারণ দৃষ্টিতে দেখার যোগ্য হতে পারে** (মলফূযাত, ২য় খন্ড, নতুন ছাপা, পৃষ্ঠা ৫৩২)।

এবারকার জার্মানীর জলসা ছিলো বর্তমান সহস্রাব্দের ঐতিহাসিক প্রথম জলসা। হুযূর (আইঃ)-এর পবিত্র সত্তার উপস্থিতির দরুন ইহা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। আগেই বলেছি জলসার শেষ অধিবেশনে (২৬-৮-২০০১ তারিখ) বিভিন্ন জাতির প্রায় অর্ধ লক্ষ মেহমান এতে উপস্থিত ছিলেন। এ জলসার বিভিন্ন দিক আগামী দিনগুলোতে আমাদেরকে যে প্রেরণা দিতে থাকবে তা বলাই বাহুল্য।

- নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আ'রাফ- ৭	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস ঃ দোয়ার গুরুত্ব	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৩-৪
❑ অমৃত বাণী ঃ আধ্যাত্মিক যুদ্ধের আদর্শ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা	৪ ও ১০
❑ জুমুআর খুতবা ঃ রহমান সিফতের আরও ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৯
❑ মুলাকাৎ	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১১-১৩
❑ হাদীস-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	ঃ জনাব এ, এইচ, এম, আলী আনোয়ার (মরহুম)	১৪-১৮
❑ রসূল করীম (সঃ)-এর সাহাবাগণের জীবন চরিত্র মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৯-২১
❑ নবরূপ ইসলামের আত্মকথা	ঃ জনাব মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী	২২-২৩
❑ ছোটদের পাতা ঃ নেসাবে ওয়াক্‌ফে নও (১৪-১৫ বছরের বালক-বালিকাদের জন্যে পাঠ্য-সূচী)	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৪-২৫
❑ রাখে খোদা মারে কে?	ঃ জনাব মোহাম্মদ মুস্তফা আলী	২৫
❑ আন্তর্জাতিক সালানা জলসা জার্মান ২০০১ ঃ দ্বিতীয় দিনের ২য় অধিবেশনের রিপোর্ট	ঃ মৌঃ শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন	২৬-২৭
❑ নতুনদের পাতা ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাহাবীদের কুরবানী	ঃ মৌঃ শেখ আব্দুল ওয়াদুদ	২৮-২৯
ইসলামী সাম্যবাদ	ঃ মৌঃ এস, এম তৌহিদুল ইসলাম	৩০-৩১
একাধিক বিবাহ ও হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর আদর্শ	ঃ জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর বাবুল	৩২-৩৩
❑ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গাছ-পালা ও উদ্ভিদের গুরুত্ব	ঃ অধ্যাপক ডঃ মোঃ আমীর হোসেন	৩৪
❑ সংবাদ	ঃ	৩৫-৩৬

প্রচ্ছদ ঃ ভারতের পাঞ্জাবের অন্তর্গত কাদিয়ানে মসজিদে মোবারক ও মিনারাতুল মসীহ্

ড্রাইভার আবশ্যক

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগের নিমিত্তে ড্রাইভার পদে আহমদী সদস্যগণের নিকট হতে নিম্নবর্ণিত শর্তে আবেদন পত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।

১। প্রার্থীকে কমপক্ষে মাধ্যমিক পাস হতে হবে।

২। হালকা / মধ্যম মানের গাড়ী চালনার বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

৩। ম্যানুয়েল ও অটোগিয়ার গাড়ী চালনায় দুই বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৪। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনকারীকে সাম্প্রতিক তোলা ২ (দুই) কপি পাস-পোর্ট সাইজের ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্র জামাতের আমীর / প্রেসিডেন্ট সাহেব কর্তৃক সত্যায়ন করে মূল আবেদন পত্রের উপর সংশ্লিষ্ট জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট ও কায়েদের সুপারিশসহ আগামী ১০-০৯-২০০১ তারিখের মধ্যে স্বহস্তে লিখিত আবেদন পত্র আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা ৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১ বরাবরে পৌছাতে হবে।

উক্ত তারিখের পর কোন আবেদন পত্র গ্রহণ করা হবে না।

- **মাহ্‌বুবুর রহমান**
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম, জামাত, ঢাকা

মোয়াল্লেম রিফ্রেশার্স কোর্স-২০০১

আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০১ হতে ২৮ সেপ্টেম্বর , ২০০১ দুই সপ্তাহ ব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এর মোয়াল্লেম রিফ্রেশার্স কোর্স ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা। জুলাই ২০০১ এর পূর্বে নিযুক্তি প্রাপ্ত সকল মোয়াল্লেম সাহেবকে উক্ত কোর্সে অংশ গ্রহণ করতে যথাসময়ে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

- **মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্**, জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

মুসী সাহেবানের জ্ঞাতব্য

"ওসীয়্যত ধারা নং ৬৯ মোতাবেক প্রতি বছর বাৎসরিক 'আসল আমদ ফরম' পূরণ করে দফতর ওসীয়্যতে প্রেরণ করা প্রত্যেক মুসীর জন্য ওয়াজিব"। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের সকল মুসীকে ২০০০-২০০১ আর্থিব বছরের 'আসল আমদ ফরম' পুরণ করে আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দফতরে পৌছানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। পূর্ববর্তী কোন সালের 'আসল আমদ ফরম' পূরণ করা না হয়ে থাকলে উহাও একই ফরমে সংযুক্ত করে পেশ করতে হবে। প্রয়োজনে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিস থেকে উপরোক্ত ফরম সংগ্রহ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- **মোহাম্মদ ফজলুর রহমান**, সেক্রেটারী ওসীয়্যত
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

কুরআন মাজীদ

সূরাতুল আ'রাফ - ৭

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালককে কাকুতি-মিনতি করে ডাক এবং সংগোপনে (ডাক)। নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে পসন্দ করেন না।

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۚ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। আর তোমরা পৃথিবীতে তাতে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের ৯৮৮ পর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না এবং ভয় ও আশার সঙ্গে তাঁকে ডাক। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রহমত সৎকর্মশীলদের৯৮৯ নিকটবর্তী।

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۚ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। এবং তিনিই যিনি স্বীয় কৃপার৯৯০ পূর্বে বায়ুরাশিকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য পাঠান, এমন কি যখন তা ঘন মেঘ বহন করে, তখন আমরা তা কোন নিষ্প্রাণ ভূভাগের দিকে পরিচালিত করি; অতঃপর তা থেকে আমরা পানি অবতীর্ণ করি, তারপর তদ্বারা সর্বপ্রকার ফল-ফসলাদি উৎপন্ন করি-একইভাবে আমরা মৃতদেরকে (জীবন্ত করে) বের করি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِىْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ۚ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿٥٩﴾ ع ١٤

৫৯। আর যে উত্তম ভূ-খন্ড, তাতে তার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশক্রমে (প্রচুর) উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়; কিন্তু যা নিকৃষ্ট, তাতে উৎপন্ন হয় নগণ্যই৯৯১। এভাবেই আমরা কৃতজ্ঞ জাতির জন্য নিদর্শনাবলী সবিস্তারে বর্ণনা করি।

৭ম রুকূ

৯৮৮। এই উক্তির অর্থ যে 'কুরআন করীম'- নাযেল হওয়ার পূর্বে কাফিরদের অসাধু জীবন যাপনের কিছু অজুহাত ছিল; কিন্তু যখন তাদের নিকট নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ পথ-নির্দেশ এসে গেল, তখন কোনরূপ অমঙ্গলকর বা বিবাদ ঘটাবার এবং পাপাচার ও অন্যায়ের মধ্যে জড়িত হবার এবং কোনরূপ শাস্তি বা ঝুঁকি ব্যতিরেকে অসৎ জীবন যাপন করবার অজুহাতের অবকাশ থাকলো না। 'ইসলাহ্' (অর্থ-বিন্যাস, যথাযথ) শব্দ সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের প্রতি ইংগিত করে, যা কুরআন নাযেল এবং নবী করীম (সঃ)-এর আবির্ভাবের সাথে কায়েম হয়েছিল।

৯৮৯। "মুহসীন" (অর্থ-সৎকর্মশীল) "যে ব্যক্তি সৎকর্মে পরিপূর্ণতা লাভ করার জন্য চেষ্টা বা পরিশ্রম করতে থাকে।" আঁ হযরত (সঃ)-এর বিখ্যাত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 'মুহসীন' সেই সৎকর্মশীল ব্যক্তি, যে প্রকৃতই আল্লাহ্‌তাআলাকে দেখে অথবা অন্ততঃপক্ষে সে জানে যে, আল্লাহ্ তাকে দেখছেন (বুখারী ও মুসলিম)।

৯৯০। "রহমত" বা কৃপা শব্দ এ স্থানে বৃষ্টির প্রতি ইংগিত করছে। জড়জগতে ঠিক যেমন বৃষ্টির পূর্বে হিমেল বাতাস অগ্রগামী দূতের কাজ করে একইভাবে আল্লাহ্‌তাআলার প্রত্যাদিষ্ট নবী আবির্ভূত হওয়ার প্রাক্কালেও মানুষের মধ্যে সাধারণভাবে এক প্রকার ধর্মীয় জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। অত্র আয়াতে এটাই ব্যক্ত হয়েছে যে, বৃষ্টির পানি যেমন মৃত বা অনুর্বর ভূমিতে উর্বরতা বা নূতন জীবনের সঞ্চার করে বলে তাতে ফল, সব্জি এবং শস্যাদি উৎপন্ন হয়, সেরূপ স্বর্গীয় পানিরূপী ঐশী-বাণী আধ্যাত্মিক জীবন বিবর্জিত মানুষের মধ্যে নতুন জীবনের সঞ্চার করে। এই আয়াত এক প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, কুরআনরূপী ঐশী-পানি অবতরণের ফলে বিবর্ণ, শুষ্ক, বন্ধ্যা এবং অনুর্বর আরবের মরুভূমি শীঘ্রই ফলে ভরপুর বৃক্ষরাজি-পূর্ণ সুগন্ধী যুক্ত রাশি রাশি ফুলে সুশোভিত উদ্ভিদরাজিপূর্ণ এক বাগানে রূপান্তরিত হবে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, যারা এযাবৎ মানবতার আবর্জনাস্বরূপ, পঙ্কিল এবং নিকৃষ্ট অংশস্বরূপ বিবেচিত হয়ে আসছিল আরববাসীরা হঠাৎ মানবের শিক্ষাগুরু বলে এবং নেতারূপে উত্থিত হলো।

৯৯১। বৃষ্টি যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভূমির প্রকৃতি ও গুণানুযায়ী ভিন্ন-ফসলাদি উৎপাদন করে থাকে, তদ্রূপ ঐশী-বাণী বিভিন্ন মানুষকে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রভাবান্বিত করে থাকে। বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন যে, তিন প্রকার ভূমি আছে ঃ (ক) ভাল, সমতল ভূমি যখন তা বৃষ্টির পানিতে সিঞ্চিত হয়, পানি শুষে নেয় এবং উত্তম গাছপালা উৎপাদন করে ও প্রচুর ফল দিয়ে থাকে, (খ) নিম্ন এবং কঠিন বা শীলাবৎ শক্ত ভূমি বৃষ্টির পানিকে সংগ্রহীত করে রাখে, কিন্তু তা শোষণ করে না এবং এ কারণে গাছ-গাছড়া ইত্যাদি উৎপন্ন করে না, কিন্ত মানুষ এবং পশু পাখীর পানীয় জলের যোগান দিয়ে থাকে, (গ) উঁচু শীলাভূমি, যা বৃষ্টির পানিকে না সংগ্রহ করে, না শোষণ করে এবং উদ্ভিদাদি উৎপাদনের এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের উভয় উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম। একইভাবে মানুষও তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে। যেমন - (১) সেই সকল লোক, যারা ঐশীবাণী দ্বারা শুধু নিজেরাই লাভবান হয় না, অধিকন্তু অন্যের জন্যেও আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশনার উৎসরূপে প্রমাণিত হয়, (২) যারা ঐশীবাণী থেকে নিজেরা কোন ফায়দা অর্জন করে না, কিন্তু তা লাভ করে এবং অন্যান্যদের উপকৃত হওয়ার জন্য তার সঞ্চিত ভান্ডার রেখে যায় এবং (৩) যারা ঐশী বাণী থেকে নিজেরাও কোনভাবে উপকৃত হয় না এবং অন্যদের ব্যবহারের জন্যেও তা সংরক্ষিত করে রাখে না- তারাই সেই ভূমি সদৃশ্য যা কোন কিছু উৎপন্ন করে না পানি সঞ্চিতও করে না, যাতে মানুষ এবং পশু-পাখীরা পান করতে পারে।

হাদীস শরীফ

দোয়ার গুরুত্ব

কুরআন ঃ

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ .....

(আল্লাহ্ ছাড়া) কে আছে যে উদ্বিগ্ন ব্যক্তির দোয়া শুনেন যখন সে তাঁর নিকট দোয়া করে এবং তার কষ্ট ও অনিষ্ট দূর করে দেন?..... (২৭ঃ৬৩)।

হাদীস ঃ

আন্ নু'মান বিন বশীর আনিন্নবী'য়্যে সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা ক্বালা আদ্ দু'আউ হুয়ালইবাদ

অর্থাৎ হযরত নোমান ইবনে বশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হযরত নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বল্লেন, দোয়া আসলে বড় ইবাদত। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী ইহাকে হাসান-সুন্দর, সহীহ - সঠিক হাদীস বলে আখ্যা দিয়েছেন)

ব্যাখ্যা ঃ নিঃসন্দেহে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতিতে যত নবী, রসূলগণ আবির্ভূত হয়েছেন সকলেই মানবজাতিকে এক বাক্যে সর্ব প্রথমে এই শিক্ষাই প্রদান করেছেন

যে, মানুষের তারা গরীব হোক বা ধনী সকলেরই সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগী করা। তার মর্ম এ নয় যে, আল্লাহ্ মানুষের ইবাদতের মুখাপেক্ষী; আল্লাহ্ সকল ক্ষেত্রে সকল দিক থেকে অভাবহীন ও বেনেয়ায। ইবাদতের উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রগাঢ় সম্পর্ক স্থাপন করা। আল্লাহ্ অতীব পবিত্র, আর পবিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে মানুষকে সকল প্রকার অপবিত্রতা ও কলুষ হতে মুক্ত ও পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। প্রকৃত ইবাদত আসলে আল্লাহ্‌র মহব্বতের আগুন। ময়লা লোহা আগুনে পড়লে যেমন ময়লামুক্ত হয়ে আগুনের রং ও গুণ ধারণ করে এবং আগুনের মতই হয়ে যায়, তদ্রূপ মানুষ ও আল্লাহ্‌র ভালবাসার আগুন তথা ইবাদতে ডুবে গেলে সে পুড়ে আল্লাহ্‌র রং ও গুণে গুণান্বিত হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হওয়াই মানুষের সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য।

সব ধর্মেই ইবাদতের অনেক প্রকার ব্যক্ত হয়েছে। ইসলামেও ইবাদতে অনেক প্রকার আছে। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। এ সব আকারের মধ্যে নামায হলো শ্রেষ্ঠ। যেমন আল্লাহ্‌তাআলা কুরআনে নামায প্রসঙ্গে বলেছেন **ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহে আকবর** - আল্লাহ্‌কে তসবীহ্ ও তাহমীদের মাধ্যমে স্মরণ করা সর্বাধিক বড় ইবাদত। নামায বস্তুত তসবীহ্ ও তাহমীদ, দুরূদ ও ইস্তিগফার দ্বারা গঠিত। নামাযের মধ্যে এই সব দোয়া ইবাদতের মগয, যেমন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **আস্‌সালাতো তথা আদ্দোয়াও মুখখুল ইবাদত।**

দোয়ার মাধ্যমে মানুষ যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় খোদার সঙ্গে আলাপ করতে পারে। তবে মকবূল দোয়ার জন্য বিগলিত অন্তর হওয়া শর্ত যে কথা ২৭ঃ৬৩ আয়াতে বলা হয়েছে। এরূপ দোয়া কখনও বৃথা যায় না; বিশেষভাবে সেজদার মধ্যে দোয়া দ্বারা বান্দা খোদার সর্বাধিক নিকটে পৌছে যায় (মুসলিম কিতাবুস সালাত)। এবং সেই সময় অনেক অনেক রহস্য ও তথ্য প্রকাশ পায় যেগুলি উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে যায়। প্রকৃত ও মকবুল দোয়ার জন্য এক প্রকার মৃত্যু বরণ করতে হয় যার পর মানুষকে নূতন জীবন দান করা হয়। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকল খোদান্বেষীদিগকে আল্লাহ্‌র দরবারে মকবুল ও গৃহীত দোয়া করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - **আলহাজ্জ আব্দুল আযীয সাদেক**
মুরব্বী সিলসিলাহ

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

আধ্যাত্মিক যুদ্ধের আদর্শ

এই যুগে আধ্যাত্মিক যুদ্ধের আদর্শ দেখানো প্রয়োজন।

এখন এই যুগে যেথায় আমরা বসবাস করছি যুদ্ধের অভ্যন্তরীণ নমুনা প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল এবং আধ্যাত্মিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এর উদ্দেশ্য। কেননা বর্তমানে বিভেদ ও ঐক্যের প্রচারের উদ্দেশ্যে বড় বড় উপকরণ ও অস্ত্রসস্ত্র তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও অনুরূপ অস্ত্রসস্ত্রের প্রয়োজন। কারণ এটা শান্তি ও নিরাপত্তার যুগ এবং সর্বপ্রকার সুবিধা ও নিরাপত্তা আমরা ভোগ করছি। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে নিজের ধর্মের প্রকাশ, প্রচার এবং সব করণীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারছে। তাছাড়া ইসলাম, যা নিরাপত্তার সত্যিকার পৃষ্ঠপোষক বরং প্রকৃতপক্ষে নিরাপত্তা শান্তি ও মিলনের প্রচারকই হলো ইসলাম যেমন করে এই নিরাপদ ও আযাদীর যুগে তার অতীত আদর্শ প্রদর্শন করাকে অপসন্দ করতে পারতো? সুতরাং বর্তমানে সেই দ্বিতীয় আদর্শটিরই অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সংগ্রাম-এর প্রয়োজন।

বর্তমান যুগে জেহাদ

আরো একটি কথা আছে, আর তাহলো, ঐ প্রথম নমুনা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয়ও বিবেচ্য ছিল। অর্থাৎ বীরত্ব প্রদর্শনও এর উদ্দেশ্য ছিল যা কিনা তৎকালীন দুনিয়ায় সবচেয়ে অধিক প্রশংসিত, প্রিয় ও মর্যাদাপূর্ণ মনে করা হতো। আর বর্তমানে তো যুদ্ধ একটা কৌশলরূপে গণ্য হচ্ছে। দূর থেকেও একজন লোক তোপ ও বন্দুক চালনা করতে পারে। কিন্তু সেখানে ঐ ব্যক্তিকেই প্রকৃত বীরপুরুষ মনে করা হতো যে সাহসিকতার সাথে তরবারির সম্মুখীন হয়ে যেত। কিন্তু আজকাল যুদ্ধ কৌশলতো কাপুরুষতাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এখন বীরত্বের কোন প্রয়োজন নেই বরং যার আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও নতুন তোপ ইত্যাদি রয়েছে এবং ওগুলো সে চালাতে পারে সেই সফলতা অর্জন করতে পারবে। মু'মিনদের সুপ্ত গুণাবলীর বিকাশই ছিল সেকালের যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এবং খোদাতাআলা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অতি উত্তমরূপে দুনিয়াতে এর বিকাশ ঘটিয়েছেন। বর্তমানে আর তার প্রয়োজন নেই। কারণ বর্তমান কালে যুদ্ধ-দক্ষতা কৌশল আর চোখে ধূলা দেয়ার রূপ ধারণ করেছে এবং নূতন নূতন যুদ্ধাস্ত্র ও জটিল কৌশলাদি ঐ অমূল্য ও গৌরবময় বীরত্বকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আত্মরক্ষামূলক ও সম্মুখ যুদ্ধের এ কারণেও প্রয়োজন দেখা দিত যে, ইসলাম প্রচারকগণকে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তরবারী দ্বারা দেয়া হতো। কাজেই বাধ্য হয়ে তাদের ঐ জবাবের প্রতিউত্তরে তরবারীর সাহায্য নেয়া হতো। কিন্তু আজ তরবারী দ্বারা জবাব দেয়া হয় না বরং কলম ও যুক্তি-তর্কের দ্বারা ইসলামের ছিদ্রান্বেষণ করা হয়ে থাকে। আর এ কারণেই এ যুগে আল্লাহ্‌তাআলা চেয়েছেন যে, (সায়েফ) তরবারীর কাজ কলম দ্বারা নেয়া হোক। লিখিতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিরুদ্ধবাদীগণকে হেয় প্রতিপন্ন করতে হবে। আর এ কারণেই বর্তমানে কলমের জবাব তরবারীর মাধ্যমে দেবার চেষ্টা করা কারো পক্ষে সমীচীন নয়।

(অবশিষ্টাংশ ১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

'রহমান' সিফতের আরো ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আঃ) প্রদত্ত খুতবা জুমুআ, ২০ জুলাই, ২০০১ইং তারিখ মসজিদ ফজল লন্ডন]

তাশাহ্হুদ তাআওউয, ও সূরা ফাতিহার পর সূরা ত্বা-হা'র ১০৯-১১০ নং আয়াত পড়ে খুতবা দেন।

يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ۝

অর্থ ঃ "সেদিন লোক সকল একজন আহ্বান-কারীর অনুসরণ করবে যার (শিক্ষার) মধ্যে কোনরূপ বক্রতা থাকবে না এবং 'রহমান' আল্লাহ্র সামনে (সকল) আওয়াজ নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, তখন তুমি চাপা গুঞ্জন ব্যতীত কিছুই শুনতে পাবে না" (সূরাতু ত্বা-হা ঃ ১০৯)।

আরো কয়েকদিন 'রহমান' সিফত সম্পর্কে বর্ণনা প্রবাহমান থাকবে বলে মনে হচ্ছে।

এখানে বলা হয়েছে, **লা ইওয়াজা লাহু** এ শিক্ষা এমন শিক্ষা যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই। অপর এক আয়াতে ও **আনযালা আলা আবদিহিল কিতাব ওয়া লাম ইয়াজয়াল লাহু ইওয়াজা** (সূরা কাহাফ ২ নং আয়াত) বলা হয়েছে **লা ইওয়াজা লাহু** অর্থাৎ এমন কিতাব, এমন রসূল যার মধ্যে কোন প্রকার বক্রতা নেই।

এ দু' আয়াত থেকে স্পষ্টতঃ জানা গেল যে যেমন কুরআন মজীদের **ইওয়াজা** এসেছে। (যার মধ্যে কোন প্রকার বক্রতা নেই) কারণ আঁ হযরত (সঃ)-এর স্বভাব বা প্রকৃতির মধ্যে কোন প্রকার বক্রতা ছিল না। যে ব্যক্তির মধ্যে বক্রতা থাকে সে তার অনুগত হয়ে থাকতে পারে না যার মধ্যে বক্রতা নেই। কারণ এটাই বাস্তব যে, একজন যার মধ্যে বক্রতা নেই সে এমনই একজনের অনুগত হতে পারে যার মধ্যে বক্রতা নেই। এখানে বলা হয়েছে, "ঐ দিন সকল মানুষ এমন একজনের আনুগত্য করবে যার মধ্যে কোন প্রকার বক্রতা নেই। এখানে একটি ভয়ংকর আণবিক যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যার ফলে বড় বড় অহংকারী জাতির অহংকার ভেঙ্গে যাবে এবং তাদের বক্রতা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে এবং তারা সোজা হয়ে যাবে এবং তারা সেদিন মেনে নিতে বাধ্য হবে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আনুগত্য ব্যতীত আর কোন পথ খোলা নেই। সে দিন কেউ উচ্চস্বরে কথা বলবে না। কেবল আস্তে আস্তে কথা-বার্তা হবে যার চাপা গুঞ্জন শোনা যাবে। তার পরের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ۝

অর্থ ঃ " কারও জন্য সুপারিশ কোন উপকারে আসবে না কেবল সে ব্যক্তি ব্যতীত যার পক্ষে রহমান আল্লাহ্ (সুপারিশ) করবার অনুমতি দিবেন ও যার জন্য কথা বলা তিনি পসন্দ করবেন" (২০-১০)।

এখন দুটো কথাই উল্লেখ হয়েছে। হযরত আওফ বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'আমার প্রভুর (রব্ব্) পক্ষ থেকে একজন এসে আমাকে বললেন, যেন আমি দুটো কথার মধ্যে একটি কথা গ্রহণ করি। একটি এই যে, 'আমার উম্মতের অর্ধেক সংখ্যক মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দিবেন অথবা আমি (শাফা'আত) সুপারিশ করার অধিকার পেতে পারি। আমি শাফা'আত করার অধিকার গ্রহণ করেছি। আমার শাফা'আত হবে তাদের পক্ষে যারা এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করে নি।' সুতরাং যারা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করে না তারা শাফা'আত পাওয়ার যোগ্য। দুর্ভাগ্য এই যে, আজ মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই কোন না কোনভাবে আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে শরীক করেছে। সুতরাং আঁ হযরত (সঃ) শাফা'আতের অধিকারী গ্রহণ বড়ই গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়। সুনান দারমী হযরত আবূ যার গফফারী (রাঃ)-এর বর্ণনা আছে যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "আমাকে এমন পাঁচটি বিষয়ে বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে যা অন্য কোন নবীকে দেয়া হয় নি। প্রথম ঃ আমি পৃথিবীর সকল সাদা ও কাল মানুষের জন্য নবী হয়ে এসেছি। (২) সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত মাটি আমাদের জন্য পবিত্র বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যেখানে মসজিদ বা নামায পড়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। ইতঃপূর্ব্বে কোন নবী সকল জাতির জন্য নবী ছিলেন না। আর না কারো জন্য সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত মাটি ইবাদতের জন্য গ্রহণযোগ্য করা হয়েছিল। যেখানেই নামাযের সময় হয়ে যায় সেখানেই একজন মুসলমান পরিষ্কার জায়গা দেখে নামাযে দাঁড়াতে পারে। (৩) আমার জন্য মালে গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ] হালাল করা হয়েছে। অন্য নবীদের যুগে এটা হালাল করা হয় নি। (৪) আমাকে এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত প্রতাপ ও প্রভাব-ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ঐ যুগে এক মাস পর্যন্ত পথ চললে যতদূর যাওয়া যেত। আজও এক মাস পর্যন্ত পথ চললে যতদূর যাওয়া যায় ততদূর পর্যন্ত ঐ প্রভাব ও প্রতাপ ও ভীতি প্রদর্শন ক্ষমতা বলবৎ রয়েছে। তবে আজ তো একমাসে সমগ্র পৃথিবীর সকল অঞ্চল ভ্রমণ করা সম্ভব। কারণ যানবাহন বড় দ্রুতগামী হয়েছে। সুতরাং সমগ্র পৃথিবীই আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রতাপ ও প্রভাবের আওতাধীন হয়েছে। (৫) আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমি চাও (তুমি যা চাইবে দেয়া হবে)। আমি আমার চাওয়ার এ অধিকার শাফা'আত করার জন্য সংরক্ষিত রেখেছি যা তোমাদের মধ্যে তার জন্য, যে কাউকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে নি"।

শাফা'আত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"শাফা'আত সম্পর্কে কুরআন শরীক থেকে জানা যায় যে শাফা'আত অর্থ এই যে, এক ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য দোয়া করবে যে, সে যেন তার অভিষ্ট লক্ষ্য বস্তুকে পেয়ে যায়।"

এখানে জানা গেল যে, শাফা'আত অর্থ দোয়া বলছেন।

হযরত (আঃ) লিখেছেন, "একব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য দোয়া করবে যেন তার ভাই নিজ কাম্য বস্তুকে পেয়ে যায়। অথবা তার যে কোন বিপদ কেটে যায়। অতএব কুরআন শরীফের আদেশ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি অধিক ঝুঁকে আছে সে যেন নিজ ভাইয়ের জন্য দোয়া করে যে, সে-ও যেন তার মত হয়ে যায়।"

আমাদের জন্য এখানে গুরুত্বপূর্ণ নমুনা রয়েছে। আমরা তো শাফা'আত করার উপযুক্ত নই কিন্তু আমরা আমাদের ভাইদের জন্য দোয়া করতে পারি। হুযূর (আঃ) আরো লিখেছেন, "আমরা অবশ্যই দোয়া করি, 'আল্লাহ্ তাদের শক্তি প্রদান করুন, তাদের কষ্ট দূর করুন"। এটি সববেদনা প্রকাশের একটি পন্থা। বেদ গ্রন্থে এমন সমবেদনা প্রকাশের শিক্ষা দেয়া হয় নি। বেদের অনুসারীরা একে অপরের জন্য দোয়া করতে পারে না। এটি বেদ গ্রন্থের জন্য প্রশংসার বিষয় নয় বরং এটি একটি বড় ত্রুটি। যেহেতু সকল মানুষ পরস্পর এক দেহতুল্য অতএব, আল্লাহ্ আমাদিগকে শিখিয়েছেন যে, যদিও শাফা'আত কবুল করা একান্ত তাঁরই এখতিয়ারভুক্ত তবু তোমরা নিজ ভাইদের জন্য দোয়া রত থাক, এবং সুপারিশ বা দোয়ার মাধ্যমে সমবেদনা জ্ঞাপন করা থেকে বিরত থেকো না। এটি তোমাদের পরস্পরের অধিকার বা পাপ্য।

মূলতঃ শাফা'আত শব্দটি শুফ্'আ থেকে উদ্ভুত হয়েছে। শুফ্'আ "দুইয়ের সংযুক্ত" অবস্থার নাম। অতএব একজনকে তখন শাফী (শাফ্ঈ) বলা হয় যখন সে পূর্ণ সহযোগিতা ও সমবেদনা নিয়ে অন্যের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। এমনই যেমন সে ভাইয়ের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। তার মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে তার জন্য নিরাপত্তা চায় যেমন সে নিজের জন্য চায়। স্মরণ রাখা দরকার কারোই ধর্ম-কর্ম পুর্ণতা লাভ করে না যতক্ষণ পর্যন্ত শাফা'আত আকারে তার অন্তরে অন্যের জন্য সমবেদনার সৃষ্টি না হয়।

এ ধরনের শাফা'আত অর্থাৎ অন্যের জন্য দোয়া করার স্বভাব সৃষ্টি হয়ে যাওয়া, আমার দৃঢ়-বিশ্বাস এই যে, ইহজীবনে যে ব্যক্তি এমন শাফা'আতকারী (দোয়াকারী) হবে, পরকালে আঁ হযরত (সঃ) তার জন্য (শাফী) শাফা'আত -কারী হয়ে যাবেন । এই নিয়্যত ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখার উদ্ধৃতি পেশ করেছি।

অন্য একস্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন, "একটি অন্ধকার যখন এক উজ্জ্বল আলোর সামনে আসে তখন ঐ অন্ধকার আলোয় রূপান্তরিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে যখন কোন স্বচ্ছ ও পরিষ্কার প্রকৃতির মানুষের হৃদয় ঝকঝকে আয়নার মত হয়ে যায় তখন সূর্যের সামনে এসে উজ্জ্বল আলো লাভ করে নেয়। কখনও কখনও এমন হয় যে, একটি অন্ধকার প্রকৃতির (মানুষ) হৃদয় কোন ঝক্ঝকে তক্তকে পরিষ্কার (মানুষের) হৃদয়ের সামনে এসে পড়ে তখন তার উপরও আলোর প্রতিফলন ঘটে এবং সে-ও আলোকিত হয়ে যায়। যেমন তোমরা দেখেছ যে, কোন স্বচ্ছ আয়নার উপর সূর্যের আলো পড়ে তখন ঐ আয়নার মাধ্যমে ঐ আলো পাশের দেয়ালের উপর প্রতিফলিত হয়ে তাকে আলোকিত করে। এটাই শাফা'আতের অবস্থা। শুফ্আ আরবী ভাষায় দুই এর সংযোগ বা জোড়কে বলা হয় যা বেজোড় এর বিপরীত। অতএব যে ব্যক্তি একজন কামেল ও পবিত্র-আত্মা মহাপুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে রাখে এমন, যেমন তার অঙ্গের মত তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে, তবে প্রকৃতির বিধান এই যে, ঐ পবিত্র আত্মার মহাপুরুষ তার জন্য আলো লাভ করবে। সুতরাং মুক্তি বা নাজাতের দর্শন (ফিলোসফি) এই যে, আল্লাহ্র সাথে পবিত্র সম্পর্ক স্থাপন-কারী এক চিরস্থায়ী নূরের বিকাশ হয়ে যায়।"

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿۲۷﴾

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۸﴾

অর্থ ঃ "এবং তারা বলে, রহমান আল্লাহ্ নিজের জন্য একটি পুত্র গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র বরং তারা (যাদেরকে তারা পুত্র বলছে) তাঁর সম্মানিত বান্দা; তারা তার কথা বলবার পূর্বে কোন কথা বলে না, তারা (কেবল) তাঁরই আদেশ অনুযায়ী কাজ করে" (সূরাতুল আম্বিয়াঃ ২৭-২৯)

তারা যাদের সম্পর্কে বলছে যে, তারা আল্লাহ্র পুত্র প্রকৃতপক্ষে তারা তো আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা। আল্লাহ্র তো পুত্র সন্তানের প্রয়োজন হতে পারে না। এ কারণে আল্লাহ্র সিফত রহমানের উল্লেখ বার বার হয়েছে। খ্রীষ্টানরা ও আল্লাহ্র পুত্র আছে বলে অভিযোগ করেছে। রহমান সিফতের মধ্যে এ অভিযোগের জবাব রয়েছে। তাছাড়া যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র পুত্র আসলে তারা তো আল্লাহ্রই প্রিয় বান্দা। যেমন হযরত ঈসা (আঃ) "আল্লাহ্র কথা বলার পূর্বে তারা কথাও বলে না, তারা তো কেবল তাঁর আদেশ অনুযায়ী কাজ করে।" তারা আল্লাহ্র নির্দেশের বাইরে এক পা-ও অগ্রসর হয় না। আর হযরত ঈসা (আঃ)-এরও এমনই অবস্থা ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"খ্রীষ্টানরা বলে যে, আল্লাহ্ নিজের জন্যই পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ তিনি পুত্র গ্রহণের দুর্বলতা থেকে পবিত্র এবং ঐসব লোকেরা তো সম্মানিত আল্লাহ্র বান্দা।"

এখানেও সম্মানিত বান্দা হযরত ঈসা (আঃ) এবং অন্যরাও পুণ্যবান বান্দা যাদেরকে আল্লাহ্র পুত্র বলে ধরে নিয়েছে তারা। ইবাদুম মুকরামুন অর্থ তারা সম্মানের অধিকারী আল্লাহ্র বান্দা।

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۳۷﴾

অর্থ ঃ আর যারা অস্বীকার করেছে তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে কেবল হাসি-বিদ্রূপের পাত্র বানিয়ে নেয় (এবং বলে), 'এ কিসের যে তোমাদের উপাস্যদিগের মন্দ বলে। অথচ তারাই রহমান আল্লাহ্কে স্মরণ করতে অস্বীকার করে (২১ঃ৩৭)।

সুতরাং 'রহমান' সিফত কালামে ইলাহী বা আল্লাহ্র বাণী নাযিলের সাথে সম্পর্কযুক্ত সিফত। কুরআন অবতরণের সাথেও রহমানের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ আর **'রহমান আল্লামাল কুরআন'** অর্থাৎ রহমান তিনি, যিনি কুরআন শিখিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"এ সকল কাফির এবং অস্বীকারকারীদের বলে দাও, যদি আল্লাহ্র সিফত রহমান না হোত তবে তোমরা তাঁর আযাব থেকে রক্ষা পেতে না। অর্থাৎ তাঁর রহমান হওয়ার (দয়াময়) কারণেই তিনি কাফির ও অবিশ্বাসীদের তাড়াতাড়ি পাকড়াও করেন না।" সুতরাং রহমানিয়তের সিফত বড়ই মহান গুণ যার কারণে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের গুনাহ্সমূহ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। নতুবা প্রতিটি মানুষের মধ্যে এমন দুর্বলতা ও অপরাধ রয়েছে যে আল্লাহ্ যদি পাকড়াও করতে চান তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইতঃপূর্বের আলোচনা ছিল যে, এমন পুণ্যবান আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের সম্পর্কে তারা বলে যে, এরা আল্লাহ্র পুত্র সন্তান।

সূরা আম্বিয়ার ৪৩-৪৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এমন কিছুকে মিথ্যা খোদা বানানো হয়েছে যারা আল্লাহ্র প্রিয় বা সম্মানিত নয়। এটি এতবড় ভয়ানক অপরাধ যে, তারা রাত বা দিন কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্র গযব থেকে বাঁচতে পারে না। কোন অবস্থাতেই তারা আযাব থেকে নিরাপদ নয়। তারা এমন সব বস্তু বা সত্যকে মিথ্যা খোদা বানিয়েছে যে, তারা তো তাদের কোন প্রকার সাহায্য করতে পারবে না। এমন কি তারা তো নিজেদেরও কোন সাহায্য করতে পারে না। আমরাও তাদের কোন প্রকার সাহায্য করবো না।

দেখুন, এখানে বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা মা'বূদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা কুরআন মজীদের বৈশিষ্ট্য যে, সব রকম মিথ্যা বা কল্পিত মা'বূদের (মিথ্যা খোদার) কথা উল্লেখ করেছে। প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছিল এমন যারা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা তারপর এখানে এমন কল্পিত মিথ্যা মা'বূদের কথা বলা হয়েছে যারা এত তুচ্ছ যে, কোন ক্ষমতাই তাদের নেই।

সূরা আম্বিয়ার ১১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'রহমান' এর বিরুদ্ধে তারা বিভিন্ন কথা বলে দেখতে হবে এর অর্থ কী? এখানে এর অর্থ এই যে, মু'মিন বান্দারা সকল বিষয়ে রহমান খোদার নিকট সাহায্য চায়। কাফির ও মুশরিকরা রহমান খোদার বিরুদ্ধে যা কিছুই বলে তার জন্যও তারা রহমানের কাছেই সাহায্য চায়। নতুবা মু'মিনদের নিজেদের মধ্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত তাদের কিছু করার থাকে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় ইলহাম আপনাদের সামনে পেশ করছি যেখানে 'রহমান' সিফতের উল্লেখ রয়েছে ঃ

(১) **আল্‌খায়রো কুল্লুহু ফিল কুরআনে**। যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নতুন নবুওয়তের দাবীর অভিযোগ করে তাদের জন্য এই এক ইলহামও যথেষ্ট হতে পারে। কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে যে, হযরত (আঃ)-এর হাতে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু নেই। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কুরআন ব্যতীত অন্য কিছুর কথা বলেন না। সমস্ত মঙ্গল ও কল্যাণের উৎস তাঁর কাছে কুরআন মজীদ। অন্য কিতাব নয়।

ইলায়হে ইয়াস্‌উদুল কালেমুত্ তাইয়্যেবো তাঁরই প্রতি পবিত্র কথা-বার্তা বাণীসমূহ প্রত্যাবর্তন করে।

"ওয়াল আমালুস সালেহো ইয়ারফাউহু" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি যে পবিত্র বাণী বা কথা উত্থিত হয় তার সাথে পুণ্য কর্মেরও সমর্থন থাকে। যেমন পবিত্র কথা তেমনই পবিত্র আমল বা কর্ম তাকে উচ্চতা প্রদান করে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"সকল প্রকার কল্যাণ কুরআন মজীদের অনুবর্তিতার মধ্যে নিহিত যা আল্লাহ্‌র কিতাব। রহমান খোদার প্রতি সমস্ত পবিত্র বাণীসমূহ উত্থিত হয়।"

অতঃপর **কুওওয়াতুর রহমানে লিল আব্‌দিল্লাহিস্ সামাদ**। এটি আল্লাহ্‌রই শক্তির বিকাশ যা তিনি তার বান্দার পক্ষে প্রদর্শন করবেন।

তারপর **হুকমুল্লাহির রহমান লিখালিফা তিল্লাহিস্ সুলতান, ইউতালাহুল মুলকুল আযীম ওয়া ইউফ্‌তাহু আলা ইয়াদিহিল খাযায়েনো ওয়া তুশ্‌রিকুল আরযো বেনূরে রব্বিহা। যালিকা ফাযলুল্লাহে ওয়া ফি আইয়ুনেকুম গরীব।"**

অর্থঃ ঐ আল্লাহ্ যিনি রহমান তিনি তাঁর সুলতান খলীফার (বিজয়ী খলীফা) পক্ষে নিম্নলিখিত আদেশসমূহ প্রদান করেছেন।

"তাঁকে একটি বিরাট সাম্রাজ্য প্রদান করা হবে, তাঁর হাত দিয়ে জ্ঞান ও মারেফতের জ্ঞান ভান্ডার উন্মুক্ত করা হবে। পৃথিবী তোমার প্রভুর জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠবে।"

এখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে সুলতান খলীফা বলা হয়েছে (বিজয়ী খলীফা)। তারপর বলা হয়েছে- 'তাকে বিরাট রাজ্য বা সাম্রাজ্য প্রদান করা হবে। আজ যে ব্যাপক আকারে দ্রুত গতিতে আহমদীয়ত বিশ-ব্যাপী বিস্তার লাভ করছে এটা তো সেই বিরাট রাজ্যের অনুরূপ। আর এভাবে আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করেছে আর করেই চলেছে।

অল্পকিছু কালের মধ্যে একমাত্র আহমদীয়া ইসলাম পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম হবে আর সারা পৃথিবীতে আহমদীয়ত ও ইসলামের বিজয় হবে। আল্লাহ্‌র এ অঙ্গীকার বড় শান-শওকত বা শৌর্য-বির্যের সাথে পূর্ণতা লাভ করে চলেছে আগামীতেও করতে থাকবে।

অল্পকিছু কালের মধ্যে একমাত্র আহমদীয়া ইসলাম পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম হবে আর সারা পৃথিবীতে আহমদীয়ত ও ইসলামের বিজয় হবে। আল্লাহ্‌র এ অঙ্গীকার বড় শান-শওকত বা শৌর্য-বির্যের সাথে পূর্ণতা লাভ করে চলেছে আগামীতেও করতে থাকবে।

বলা হয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান মা'রেফত [ঐশী জ্ঞান] তাঁর হাত দিয়ে উন্মুক্ত ও জারী করা হবে। হযরত (আঃ)-এর এটিও ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে,

"আমার অনুগত গোলামদেরকেও আল্লাহ্ এত বড় জ্ঞান প্রদান করবেন যে, বড় বড় জ্ঞানীদের হতবাক করে দেবেন তারা।"

পৃথিবী আল্লাহ্‌র নূরে আলোকিত হবে অর্থ এই যে, ইসলামের প্রচারের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নূর সারা পৃথিবীকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করবে। এ সমস্ত কল্যাণরাজী আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যা তোমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত কান্ড বলে মনে হবে ১৯৯৮ ইং একটি ইলহাম যা হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটির (রাঃ) এক পত্রে লেখা রয়েছে।

"ইন্নি মায়ার রহমানে আতিকা বাগতাতান" অর্থঃ "আমি হঠাৎ করে তোমার সাহায্যের জন্য রহমানের সাথে তোমার কাছে আসব।" আল্লাহ্ ভাল জানেন যে, এখানে বর্ণিত বাগতাতান অর্থ ঃ 'হঠাৎ করে আসব' এ কথা কবে কীভাবে পূর্ণতা লাভ করবে। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যেমন অন্য সমস্ত ইলহাম যথা সময়ে পূর্ণতা লাভ করেছে এ ইলহামও যথাসময়ে অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে এবং আহমদীয়তের একটি বড় নিদর্শন হয়ে প্রকাশিত হবে।

তারপর ১৩ই নভেম্বর, ১৯০৩ ইং ইলহাম **ইন্নাহু তাইয়্যেবুন মাকবুলুর রহমানে** তিনি পবিত্র এবং আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণীয় হয়েছেন।

তারপর আবার কিছু কুরআন মজীদের আয়াত যেখানে 'রহমান' সিফতের উল্লেখ রয়েছে, আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

সূরাতুল ফুরকানে ২৬-২৯ আয়াতে বলা হয়েছে, কাফিররা সেদিন দুঃখ করবে যে, কেন অমুককে আমি আন্তরিক বন্ধু বানিয়েছিলাম। ঘটনা এই যে, কোনা কোন মানুষের এমন বন্ধুও থাকে যে তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়ে বিভ্রান্ত করে। বাইরের কোন শয়তান নয় বরং কোন কাছের মানুষই শয়তান হয়ে তার পেছনে লেগে থাকে এবং তার চিন্তা-চেতনার উপর প্রভাব খাটায়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর একটি ঘটনা আছে। একবার স্কুলের একজন ছাত্র, যে আল্লাহ্‌র পথের পথিক ছিল, একদিন হুযূর (রাঃ)-এর খেদমতে অভিযোগ করে যে, আজকাল আমার অন্তরে আল্লাহ্‌র বিপক্ষে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ আমি তো একান্তই আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাসী ছিলাম। তাই আমি বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল বড় তীক্ষ্ণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি শক্তি রাখতেন। হুযূর (রাঃ) তাকে বললেন, 'তুমি এমন কোন ব্যক্তির সাথে নামাযে দাঁড়াও যে ব্যক্তি ভেতর থেকে নাস্তিক। সে বল্ল, জ্বী হুযূর। আমার এক বন্ধু আছে যে সব সময় নামাযে আমার পাশে দাঁড়ায়। হুযূর (রাঃ) বললেন, 'তুমি ঐ ব্যক্তির সাথে ভবিষ্যতে নামাযে দাঁড়াবে না। তারপর থেকে সে হুযূর (রাঃ)-এর নির্দেশ মত আমল আরম্ভ করল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তার অন্তরে পরিবর্তন ঘটে গেল এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে কুধারণা সৃষ্টি

হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সূরাতুল ফুরকানের ৬০ আয়াতে বলা হয়েছে, 'রহমান সম্পর্কে এমন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর যিনি তাঁর সম্পর্কে অধিক জানেন।' অর্থাৎ রহমান সম্পর্কে যে কেউ সঠিক তথ্য দিতে পারে না। কেবল ঐ ব্যক্তি সঠিক তথ্য দিতে পারেন যিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখেন।

এখানে 'আরশ' বলতে কী বুঝায়? "অতঃপর তিনি সুদৃঢ়রূপে আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন।" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ব্যাখ্যা থেকে সঠিকভাবে জানা যায় আরশ কী।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন ঃ

"জেনে রাখুন, আল্লাহ্তাআলা তাঁর সিফতকে তাঁর প্রকৃত সত্তার বিকাশক বা পরিচায়ক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। [সুরা ফাতিহার প্রারম্ভে যে চার সিফত বর্ণিত হয়েছে।] এবং বলা হয়েছে যে, প্রকৃত খোদা বা উপাস্য তিনিই যিনি উক্ত চার সিফতের অধিকারী। এই চার সিফত অবশ্যই প্রকৃত খোদা বা আল্লাহ্র অস্তিত্বের পরিচয় দেবার জন্য যথেষ্ট। দেখ, এই ভূপৃষ্ঠে যিনি রব্ব্ অর্থাৎ যিনি প্রভু-প্রতিপালক যিনি লালন পালন করেন তাঁকেই পূজনীয় উপাসনার যোগ্য মনে করা হয়। ভরণ-পোষণের জন্য বিষয় লাভের জন্য মানুষ মানুষকে প্রভু বানিয়ে বসে। এবং এমনভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা হয় যেমন খোদাকে করা উচিত।

অনুরূপভাবে যারা বড় বড় অনুগ্রহ্ প্রদান করেন তাদেরও উপাসনা বা পূজা করা হচ্ছে। আবার যে শক্তিধর ব্যক্তির নিকট বার বার যেতে হয় পারিশ্রমিক পাওয়ার জন্য তারও পূজা করা হয় বা প্রভুর মত ভক্তি করতে হয়। তারপর যিনি মালিক (মালিকিইয়াউমিদ্দীন) চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য যার কাছে যেতে হয় তারও পূজা করা হয়। সুতরাং এই চার সিফত, বৈশিষ্ট্য বা গুণ যাদের আছে তাদেরকেও প্রভু হিসাবে তার উপাসনা বা পূজা করা হয়। বাহ্যতঃ মুখে বলা হোক বা না হোক কার্যত ঃ তাদের উপাসনা করা হয়। এই চার সিফত সূরা ফাতিহার আরম্ভে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এই চার সিফত প্রকৃত ও পরম প্রভু বা স্রষ্টা বা আল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে যাঁর ইবাদত বা উপাসনা আবশ্যক। প্রকৃত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যেরা যারা উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী হয়ে আছে। তারা কখনও উপাস্য হতে পারে না।

উপরোক্ত সিফতসমূহের মধ্যে আল্লাহ্র সমস্ত মৌলিক গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে প্রাথমিক যুগের কথা **রব্বুল আলামীন**, মধ্য যুগের কথা **রহমান ও রহীম**, শেষ যুগের কথা **মালিকিইয়াউমিদ্দীনের** মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ্র সকল প্রকার কর্মকান্ড উপরোক্ত সিফতসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এর বাইরে কোন কিছু নেই।"

উপরোক্ত চার সিফাতকে সকল সিফতের উৎস বা মা (**উম্মাহাতুস সিফাত**) বলা হয়েছে। আল্লাহ্র কোন কর্ম উপরোক্ত সিফাতগুলোর বাইরে হয় না।

"এই চার সিফতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সমস্ত শক্তির বিকাশ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে আরশের উপর আল্লাহ্র অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ এই যে, তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত আর তাঁর শক্তির বিকাশ উক্ত চার সিফতের মাধ্যমে ঘটছে। যেমন কোন বাদশাহ্র শক্তির বিকাশ ঘটে যখন তিনি তার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। একজন শক্তিশালী বাদশাহ্ তার সিংহাসনে বসেন আর তার ইচ্ছা মত সব কিছু ঘটতে থাকে যা তিনি চান।

একদিকে বাদশাহ্র শাসন কার্য পরিচালনার জন্য যা প্রয়োজন তা সৃষ্টি হতে থাকে। বাদশাহ্র আদেশ মত প্রস্তুত হতে থাকে। এটাই প্রজা পালনের বিষয় যা সাধারণভাবে সবাই পেতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ বাদশাহ্ অনেককে অসাধারণভাবে অনেক বড় রকমের দান বা অনুদান বা অনুগ্রহ করে থাকেন যা রহমান সিফতের বহিঃপ্রকাশ বটে। তৃতীয়তঃ যারা বিভিন্নভাবে বাদশাহ্র বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকে তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রতিদান ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। আর একটি 'রহীম' সিফতের বিকাশ বলা যায়।

চতুর্থতঃ শাস্তি ও পুরস্কারের দরজা খুলে দেয়া হয়। কারো শিরচ্ছেদ করা হয় আর কাউকে শৃঙখলমুক্ত করা হয়।

উপরোক্ত চারটি (সিফত) বৈশিষ্ট্য সর্বকালে কোন রাজা বা মহারাজার ক্ষমতাসীন বা সিংহাসন লাভের সময় ঘটে থাকে। অতএব আল্লাহ্র এই চার সিফাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকার নাম আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়া আর এরই নাম আরশ।"

এ ছাড়া কোন বস্তু বা জড় পদার্থের এমন সিংহাসন নেই যার উপর কখনও আল্লাহ্ বসে থাকেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই আয়াত সম্পর্কে আরো লিখেছেন;

যখন কাফির বেদীন এবং নাস্তিকদের বলা হয় যে, 'তোমরা রহমান খোদাকেই সিজদা কর।' তখন তারা রহমানকে অস্বীকার করে প্রশ্ন করে, রহমান আবার কী? রহমান কে আবার? আল্লাহ্ উত্তরে এখানে বলেছেন, রহমান এমন সত্তা যিনি সীমাহীন কল্যাণ ও বরাকাতের উৎস এবং চিরস্থায়ী করুণাময় সত্তা, যার মধ্যে কেবলই মঙ্গল ও কল্যাণ রয়েছে। যিনি আকাশে বড় বড় স্তম্ভ নির্মাণ করেছেন এবং চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন। যদ্বারা সাধারণভাবে কাফির ও মু'মিন সকলের জন্য আলো প্রদান করেছেন। সেই রহমান তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন যারা পালাক্রমে আসছে যাচ্ছে। এতদ্দ্বারা যারা হকীকত বা মা'রেফত (ঐশী জ্ঞান) লাভ করতে চায় তারা তা লাভ করতে পারে এবং অজ্ঞতা ও মূর্খতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। যারা কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করতে চায় তারা যেন কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করে। রহমানের উপাসক তারা যারা ভূপৃষ্ঠে বড় বিনয়ের সাথে চলাচল করে এবং চলতে চলতে পথে যদি কোন মুর্খ ব্যক্তির সাথে পালা পড়ে এবং ঐ ব্যক্তি কর্কশ ভাষায় কথা বলে তবে তারা মুর্খদের শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণময় ভাষায় তাদের কথার উত্তর দেয় ও মত বিনিময় করে।"

কুরআন মজীদের আয়াত থেকে জানা যায় যে, রহমান আল্লাহ্র বান্দারা সর্বদা বিনয়ের সাথে চলাচল করেন। সকলের জন্য শান্তি ও মঙ্গলের কারণ হয়। তারা কখন অহংকারী হয় না। যদি মূর্খ ব্যক্তিরা দুর্ব্যবহারও করে তবুও তারা তাদের কথার উত্তর বড় নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে দেন। দুর্ব্যবহারের জবাবে দুর্ব্যবহার করে না বা গালির জবাবে গালি না দিয়ে দোয়া দেন এবং এভাবে রহমান চরিত্রের অনুকরণ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্র রহমান গুণকে নিজেদের মধ্যে রূপায়িত করেন।

রহমান জাতি-ধম-বর্ণ নির্বিশেষে ভাল-মন্দ সকলকে সূর্য, চন্দ্র, ভূমি ও অন্যান্য নেয়ামতের দ্বারা উপকৃত করেন। এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্তাআলা খুব স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন, রহমান নাম উপরে বর্ণিত অর্থে আল্লাহ্র জন্য ব্যবহার হয়েছে। তাঁর রহমত ও বরকত ছোট বড়, ভাল মন্দ সকলের উপর সুবিস্তৃত হয়ে আছে।"

আজ জুমুয়ার পর কয়েকজনের জানাযা গায়েব হবে। অতএব আপনারা জুমুআর পরের দু'রাকাত সুন্নত নামায পড়ে নিবেন। তারপর জানাযা পড়া হবে।

যাদের জানাযা গায়েব হবে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নপ্রকার। সর্ব প্রথম বড় দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে,

১। আমার বড় বোন, (আপন বোন) বিবি আমাতুল হাকীম সাহেবা ১৮ জুলাই, বুধবার দিনের বেলা এগারটা ৪৫ মিনিটে ফযলে ওমর রাবওয়াহ্ হাসপাতালে ইনতেকাল করেছেন।

(ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্নাইলায়হে রাজেউন) বয়স ৭৫ বছর হয়েছিল।

সাড়ে সতর বছর বয়সে তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। তাঁর ওসীয়্যত ফর্মে হযরত আব্বাজান ও হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ)-এর স্বাক্ষর রয়েছে।

আমার এ বোন গরীবদের প্রতি বড়ই সদয় ছিলেন। তাঁর দোয়া কবুল হোত। সত্য-স্বপ্ন রুইয়া দেখতেন। নিজেও গরীব দরবেশের মত জীবন যাপন করে গেলেন। গরীবদের দুঃখের তিনি অংশীদার থাকতেন।

১০ই নভেম্বর, ১৯৪৬ ইং তারিখে মোহ্তরম সৈয়্যদ দাউদ মুজাফ্ফর শাহ্ সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পরে দীর্ঘ দিন সিন্ধু দেশে তিনি অবস্থান করেছিলেন। সেখানে লাজনা ইমাইল্লাহ্র সংগঠনকে সুসংগঠিত করেছিলেন। আল্লাহ্তাআলা তাঁকে ৬ পুত্র ৩ কন্যা দান করেছেন। তাঁর সৌভাগ্য যে, তাঁর তিন ছেলে জামাতের খেদমতের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জামাতী কাজে নিয়োজিত আছেন। তাঁর তিন মেয়েই ওয়াকফে জিন্দিগী (উৎসর্গকৃত জীবন) যুবকের সাথে বিবাহিত হয়েছেন।

আমার এ বোনের মৃত্যুতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আমার কাছে অসংখ্য শোক-পত্র আসছে। হয়ত আরো পত্র আসতে পারে। আমার বা আমার অফিসের কর্মীদের জন্য প্রত্যেককে এমন পত্রের পৃথক পৃথক উত্তর লেখা সম্ভব হবে না। তাই আমি আপনাদের সকলের শোক-পত্রের উত্তর দিচ্ছি এবং আপনাদের সকলের নিকট শুকরিয়া জানাচ্ছি।

এখন নামাযের পরে আমার এ বোনের নামায জানাযা গায়েব পড়াব। এর সাথে আরো কয়েকজনের নামায জানাযা গায়েব পড়াব। তাদের পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

১। হযরত মৌলানা শেখ মোবারক আহমদ সাহেব। হযরত মৌলানা শেখ মোবারক একজন বড় পুরানো বুযূর্গ মুরব্বী সিলসিলাহ্ প্রায় ৭০ বছর জামাতের খেদমত করেছেন। বড় গৌরবোজ্জ্বল খেদমত করে গত ৯ই মে, ২০০১ প্রায় ৯০ বছর বয়সে ওয়াশিংটন শহরে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। ১৯৭৯ ইং সনে তিনি ইংল্যান্ডের আমীর ও মুরব্বী ইনচার্জ। তারপর ১৯৮৩ ইং সনে আমেরিকার আমীর ও মুরব্বী ইনচার্জ নিযুক্ত হয়েছিলেন। এসব দেশে বিশেষ করে মসজিদ ও মিশন হাউজ নির্মাণের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। তিনি একজন নিবেদিত প্রান খাদেম দীন ছিলেন। তিনি যে সব দেশে মুরব্বী ছিলেন সে সব দেশে বড় বড় সাফল্য অর্জন করেছেন। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন।

২। মোহতরম চৌধুরী আব্দুর রহমান সাহেব অ্যাডভোকেট, সাবেক আমীর জামাত গুজরাঁওয়ালা মরহুমের কথা বলছি। তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ খাদেম ছিলেন। ৬৮ বছর বয়সে তিনি ১৮ মে, ২০০১ ইং লাহোরে মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। তার পিতার নাম ছিল আব্দুল হামীদ সাহেব। তার দাদা, নানা ও মা সাহাবী ছিলেন। অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, বিনয়ী ছিলেন। ১৯৭৪ ইং সনে পাকিস্তানে যখন বড় যুলুম চলছিল তখন তিনি আমীর ছিলেন এবং অত্যাচারীতদের আশ্রয়স্থল ছিলেন। তাঁর বাসভবন মুহাজেরীনের জন্য ক্যাম্পস্বরূপ ছিল। মোহতরম চৌধুরী কাযা বোর্ডের ও মজলিস তাহরীকে জাদীদেরও মেম্বর ছিলেন। তিনি ১৩ বছর সদর কাযা বোর্ড এবং ৯ বছর গুজরাঁওয়ালার আমীর হিসাবে খুবই উল্লেখযোগ্য খেদমত করেছেন। তিনি স্ত্রী ও চার পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন।

৩। মৌলভী আব্দুস সালাম তাহের সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ ও পরবর্তীতে প্রোফেসর জামেয়া আহমদীয়া, ২৮ মে, ২০০১ ইং ৫৭ বছর বয়সে লাহোরে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। ৩০ মে, ১৯৪৪ ইং পিতা মৌঃ আহমদ আলী সাহেবের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর দাদা ও বড় চাচা সাহাবী ছিলেন। ১৯৬০ ইং সনে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং ১৯৭০ ইং সনে শাহেদ পাশ করে মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসাবে বিভিন্ন জামাতে খেদমত আরম্ভ করেছিলেন। স্ত্রী ও চার পুত্র ও এক কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। এক ছেলে মুকাররম্ জারি উল্লাহ্ রাশেদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্ এবং আব্দুল হালীম সাহেব শাহেদ মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ হয়ে কর্মরত আছেন।

৪। ক্যাপ্টেন হাজী আহমদ খান আইয়ায সাহেব জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রথম যুগে হাঙ্গেরীতে মুরব্বী ছিলেন। পরবর্তীতে অবস্থার কারণে কার্যতঃ মুরব্বী হিসাবে কর্মকান্ড জারী রাখতে পারেন নি। কিন্তু তবুও উৎসর্গীত জীবনের মতই জীবন যাপন করে গেছেন। খারিয়াঁন জেলা গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন। ১৯ এপ্রিল, ২০০১ ইং ৯২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করে গেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। মুসী ছিলেন। বেহেশ্তী মাকবেরা বারওয়াহ্ দাফন হয়েছেন। ১৯৩৫ ইং সনে তিন বছরের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভাকীয়া পোল্যান্ডে মুরব্বী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ঐ সময় ওয়াকফ তিন বছরের জন্য নেয়া হোত।

৫। জনাব আহমদ দীন সাহেব (ফ্যাকট্রি এরিয়া রাবওয়াই) মরহুমেরও জানাযা গায়েব পড়াব। তাঁর পুত্র মুরব্বী সিলসিলাহ্ আমাকে খবর পাঠিয়েছেন। আমার-পত্রের নকলও আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি ১৯৯৩ ইং এক পত্রে তাকে লিখেছিলাম যে, আমি তাঁর জানাযা পড়াব। আল্লাহ্ জানেন কে কবে মারা যাবে। কিন্তু আমি আমার ওয়াদা পালনের সুযোগ পাচ্ছি। আজ তাঁরও জানাযা গাযেব পড়ান।

জুমুআর নামাযের পরে সুন্নতের পরে উপরে উল্লেখিতদের জানাযা গায়েব পড়ানো হবে।

অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাস্হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত

অমৃতবাণী ঃ ৪পৃষ্ঠার পর

বর্তমানে কলমের প্রয়োজন

নিশ্চিত জেনে রেখো বর্তমানে যা প্রয়োজন, তা তরবারীর নয় বরং কলমের। আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ ইসলামের প্রতি অমূলক সন্দেহ ও বিভ্রান্তি আরোপ করে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলার সত্য ধর্মের ওপর আক্রমণে উদ্যত হয়েছে। তাদের এসব কার্যকলাপ আমার মনযোগ এদিকে আকর্ষণ করেছে যে, আমি কলমের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এই জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতির যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই এবং ইসলামের আধ্যাত্মিক শৌর্য-বীর্য এবং অভ্যন্তরীণ শক্তির বিষয়ও প্রদর্শন করি। এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার আমার কী-ই বা যোগ্যতা ছিল। এটা কেবল আল্লাহ্‌তাআলারই অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে এর রহস্য দান করেছেন। এবং তিনি এটা চান যে, আমার মত একজন দুর্বল মানুষের মাধ্যমে তাঁর ধর্মের গৌরব প্রকাশিত হোক। আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি ও আক্রমণ এর সংখ্যা একবার গণনা করে দেখেছি। আমার অনুমান ও ধারণায় এর সংখ্যা হয়েছিল তিন হাজার। এবং আমার ধারণা মতে বর্তমানে এই সংখ্যা আরো বেড়ে যেতে পারে। এরূপ যেন মনে করা না হয় যে, ইসলাম এরূপ দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, এর বিরুদ্ধে তিন হাজার আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে। না, কখনো এরূপ নয়। এগুলোতো অদূরদর্শী ও অজ্ঞদের দৃষ্টিতে আপত্তি। কিন্তু আমি তোমাদেরকে সত্যি সত্যি বলছি – ঐ আপত্তিগুলো গণনাকালে আমি এটাও চিন্তা করে দেখেছি যে, ঐ **আপত্তিগুলোর গভীরে প্রকৃতপক্ষে অনেক বিস্ময়কর সত্য নিহিত রয়েছে,** অন্তর্দৃষ্টির অভাবে যা আপত্তিকারীগণের দৃষ্টিগোচর হয় নি। এবং প্রকৃতপক্ষে এটা খোদাতালার প্রজ্ঞা, যে **অজ্ঞ আপত্তিকারীগণ যেখানে এসে বাধা পাচ্ছে সেখানেই তিনি সত্য ও জ্ঞানের গুপ্ত ভান্ডার রেখে দিয়েছেন।**

খোদা আমাকে কুরআনের গুপ্ত ধন ভান্ডারকে পৃথিবীতে উন্মুক্ত করার জন্য প্রেরণ করেছেন।

এবং খোদাতাআলা আমাকে প্রেরণ করেছেন যেন ঐ গুপ্ত ধন-ভান্ডারকে দুনিয়াতে উন্মুক্ত করে দিই। এবং ঐ উজ্জ্বল মণি-মুক্তার উপর অপবিত্র আপত্তির যে কাদা লেপন করা হয়েছে তাথেকে সেগুলোকে পবিত্র ও পরিষ্কার করি। বর্তমানে খোদাতাআলার অতীব আবেগজনক মর্যাদাবোধ প্রত্যেক নাপাক দুশমনের আপত্তির কলঙ্কের দাগ থেকে কুরআন শরীফের সম্মানকে বিমুক্ত ও পবিত্র করতে চায়।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে যেখানে বিরুদ্ধবাদীরা কলম দ্বারা আমাদেরকে আক্রমণে উদ্যত এবং তা করছেও সেখানে তাদের সাথে লাঠা-লাঠি করার প্রস্তুতি নেয়া কতটুক বোকামী হবে? আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি যে, এ অবস্থায় কেউ যদি ইসলামের নামে এর জবাবে যুদ্ধ বিগ্রহের রীতি অবলম্বন করে তাহলে সে ইসলামের দুর্নাম করবে। এবং ইসলামেরও কখনো এরূপ ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য ছিল না যে, বিনা উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনে তরবারী ধারণ করে। যেমন আমি বলে এসেছি বর্তমান যুদ্ধ কলা-কৌশলে রূপান্তরিত হওয়ায় এর উদ্দেশ্য আর ধর্মীয় থাকছে না। বরং পার্থিব উদ্দেশ্য এর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আপত্তিকারীকে প্রতিউত্তর না দিয়ে তরবারী দেখালে তা কত বড় যুলুম হবে? এখন যুগের সাথে সাথে যুদ্ধের দিকও পাল্টে গেছে। এজন্য সব থেকে আগে প্রয়োজন নিজের মন ও মস্তিষ্ককে কাজে লাগানো, আত্মার পবিত্রতা সাধন করা এবং সত্যবাদিতাও তাকওয়াপরায়ণতার সাথে বিজয়ের জন্য খোদাতাআলার নিকট সাহায্য কামনা করা। এটা খোদাতাআলার এক অটল নিয়ম এবং স্থায়ী বিধান তর্ক-বিতর্ক ও বাক-বিতন্ডার মাধ্যমে যদি মুসলমানগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফলতা ও বিজয় লাভ করতে চায় তা সম্ভব হবে না। আল্লাহ্‌তাআলা লম্ফ-ঝম্প ও মুখের কথা চান না। তিনি সত্যিকারের তাকওয়া চান এবং প্রকৃত পবিত্রতাকে তিনি পসন্দ করেন। যেমন তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে আছেন যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তাহাদেরও যাহারা সৎকর্মশীল (১৬ঃ১২৯)।

কর্মে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করা উচিত

বিবেক-বুদ্ধিকেও আমাদের কাজে লাগাতে হবে। কেননা বিবেক-বুদ্ধির কারণেই মানুষ পরিশুদ্ধ হয়। কোন মানুষই অযৌক্তিক কথা মানতে বাধ্য হতে পারে না। শক্তি ও ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন প্রকার আইনী কষ্ট (কাউকে) ভোগ করতে হয় নি। "আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধ্যাতীত-কষ্টকর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না" (২ঃ২৮৭)। এই আয়াতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌তাআলার আদেশাবলী এরূপ নয় যে, তা পালন করা কারো পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। আপন উত্তম বাগ্মিতা, অনর্গল বক্তৃতায় পারদর্শিতা ও প্রহেলিকা সাজানোর গৌরব মানুষকে প্রদর্শনের জন্য খোদাতাআলা তাঁর বিধান ও নির্দেশনাবলী পাঠান নি। এবং এভাবে আগে থেকেই কি তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, এই অযোগ্য দুর্বল মানুষ এসব আদেশাবলী পালনে সক্ষম হবে না? খোদাতাআলা এ থেকে উন্নত ও পবিত্র। তিনি এরূপ বাজে কাজ করতে পারেন না। হ্যাঁ, তবে খৃষ্টানদের ধর্ম-বিশ্বাস হলো যে, দুনিয়াতে কোন মানুষের পক্ষেই ধর্মীয় বিধানের আনুগত্য ও খোদার আদেশাবলী পালন করা সম্ভব নয়। মুর্খরা এটুকুও জানে না যে, তাহলে খোদার ধর্মীয় বিধান অবতীর্ণ করার কি প্রয়োজন ছিল? তাদের বিশ্বাস ও ধারণা মতে আল্লাহ্‌তাআলা যেন (আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই) অতীতের নবীগণের উপর শরীয়ত (ধর্ম বিধান) অবতীর্ণ করে এক অযৌক্তিক ও নিরর্থক কাজ করেছেন! প্রকৃতপক্ষে খোদার পবিত্র সত্তার উপর এ ধরনের কলঙ্ক লেপনের প্রয়োজন হয়েছে খৃষ্টানদের প্রায়শ্চিত্ববাদের অসার তত্ত্ব আবিষ্কারের পরিণামে।

আমি নির্বাক ও তাজ্জব হয়ে যাই যে, ঐ লোকগুলো নিছক নিজেদের তৈরী এক অসার মতবাদের ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠার জন্য এ বিষয়ে কোনরূপ শঙ্কা বোধ করছেন যে, এ দ্বারা খোদার সত্তার উপর কি ধরনের জঘন্য অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে! (চলবে)

(মলফূযাত ১ম খন্ড)

অনুবাদ- মোহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা

মুলাকাৎ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) এর সাথে বাঙ্গালীদের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান, তারিখ ১০ জুলাই ২০০১ইং

প্রথম প্রশ্ন ঃ কুরআন করীমে আছে **আতিউল্লাহ্ ওয়া আতিউর রসূলা ওয়া উলিল আমরে মিনকুম"** (সূরা নিসা)

"উলিল্ আমর" যদি অন্যায় করে তবে উলিল্ আমর-এর কথা আমরা কীভাবে মানব?

হুযূর (আইঃ) উত্তরে বলেন ঃ সূরা নিসা-এর এ আয়াতটি যে বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে সে বিষয়টা সামনে আসে নি, তাই আমি আগে সে বিষয়টির উল্লেখ করবো। অ-আহমদী আলেমরা বলে থাকেন, এখানে "উলিল আমর" দ্বারা শুধু মুসলমান শাসকদের বুঝানো হয়েছে কিন্তু প্রকৃত অর্থে কুরআন করীম যা বলেছে তা সব শাসকদের ওপরে প্রযোজ্য; তারা মুসলমান হতে পারেন আবার অমুসলমানও হতে পারেন। বলা হয়েছে, শাসকরা যা-ই সিদ্ধান্ত দিবেন তা-ই মুসলমানদের মানতে হবে। তাদের কথার বিরুদ্ধে যাওয়া যাবে না। শাসক যদি অন্যায় করে, অত্যাচার করে তবুও তার কথা অনুসারে চলা ছাড়া তোমাদের উপায় নেই।

হুযূর বলেন, শাসক ন্যায় করল না অন্যায় করল এ সিদ্ধান্ত কে নেবে? একজন অধীনস্থ ব্যক্তির কথায়, তার কর্তা অন্যায় করেছে বলে যথেষ্ট প্রমাণিত হতে পারে না। পসন্দ হলেই কর্তার পক্ষে বলবে অপসন্দ হলেই কর্তার বিপক্ষে বলবে আর তাকে যালেম আখ্যা দেবে তা হতে পারে না।

হুযূর বলেন, ব্যাপারটা আল্লাহ্-এর উপর ছেড়ে দিতে হবে। সে যদি মজলুম হয় তাহলে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবে আল্লাহ্ যেন খারাপ শাসকের জায়গায় ভাল ন্যায়-পরায়ণ শাসকগণ দেন। কিন্তু কথা তার মানতে হবে। বিদ্রোহ করা চলবে না।

হুযূর বলেন, আর একটা দিকও উল্লেখ করা দরকার। পবিত্র কুরআন করীমই বলেছে, **ফাইন তানাযাতুম ফী শায়ইন ফারুদ্দু ইলাল্লাহে ওয়া রুসূলী**-এর অর্থ হচ্ছে কোন বিষয়ে যদি শাসকের সাথে তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ হয় সে ক্ষেত্রে তোমাদের মীমাংসার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে যেতে হবে। আল্লাহ্ ও রসূলের শিক্ষার আলোকে বিষয়টাকে দেখতে হবে। এখানে হুযূর বলছেন, যে বিষয়ে মত পার্থক্য হতে পারে, বিষয়টা কী? বিষয়ের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়ে যদি তোমাদের শাসকের সাথে কোন দ্বিমত হয়ে থাকে, অমত থাকে, মত পার্থক্য থাকে সে ক্ষেত্রে তোমরা সরকার বা শাসককে কোনভাবে অনুসরণ করবে না। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল যে শিক্ষা দিয়েছেন সে শিক্ষাকে অনুসরণ করবে। পাকিস্তানের পেক্ষাপটে হুযূর বলেন, সেখানে মোল্লাদের পক্ষ থেকে এবং সরকারের পক্ষ থেকে আহমদীদের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বা চাপানো হয়েছে তারা নামায পড়তে পারবে না বা ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করতে পারবে না কিন্তু সেক্ষেত্রে আহমদীরা সরকারের আদৌ তোয়াক্কা করে না এবং মোল্লাদেরও অনুসরণ করে না। এখানে আহমদীরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের যে শিক্ষা সেটাকেই অনুসরণ করছে এবং মানছে। পাকিস্তানের আইন অনুসারে এটা যদিও অপরাধ এবং এ অপরাধের কারণে সমাজ তাদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছে সে কষ্ট আহমদীরা সহ্য করছে অথচ সেখানে তারা মোল্লা ও সরকারের কথা মানছে না। আল্লাহ ও রসূলের শিক্ষাকেই তারা অনুসরণ করছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ খিলাফত আলা মিন্হাজিন নবুওয়ত বলতে কী বুঝায়?

হুযূর বলছেন, হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর পর যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে খিলাফতই হ'ল "খিলাফত আলা মিন্হাজিন নবুওয়ত"। যেমন হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর খিলাফত, হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফত, হযরত উস্মান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফত। তারা বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে যে সমস্ত সমাধান দিয়ে গেছেন, ব্যক্তিগত বিষয়ে যে সমস্ত সমাধান দিয়ে গেছেন বা আইন বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত বা ন্যায়ানুগ বিষয়ে সমাধান দিয়ে গেছেন সে সমস্ত সমাধানই জামাতে আহমদীয়ার খেলাফত অনুসরণ করছে। অতএব জামাতে আহমদীয়ার খেলাফত ঐ খেলাফতের অব্যাহত ধারা।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও জাতিগত পর্যায়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণগুলি কী কী?

হুযূর বলেন আধ্যাত্মিক উন্নতি বুঝার সহজ উপায় হ'ল মানুষের নৈতিক আচরণ অবলোকন করা। তাদের আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে বুঝা যাবে যে, সে ব্যক্তি বা সে জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে কিনা। যদি প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের সাথে আচার-আচরণে উন্নতি প্রমাণ না করা যায় তাহলে তার আধ্যাত্মিক উন্নতির দাবী অর্থহীন হবে।

চতুর্থ প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি যদি নিজের চাঁদা ও পরিবারের চাঁদা সঠিকভাবে আদায় করে তার পরেও কি তাকে "যাকাত" দিতে হবে?

হুযূর বলেন, যাকাত-এর বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়। ঐসব ক্ষেত্রে যাকাত দিতে হয় যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত কোন গয়না-গাটি স্ত্রীলোকের থাকে অথবা যদি পুরো এক বছর ব্যাংকে টাকা অব্যবহৃত ভাবে জমা থাকে। কিন্তু চাঁদা একটা ভিন্ন জিনিষ। যাকাতের হার আমাদের জামাতের চাঁদার হারের তুলনায় অনেক কম। আহমদীরা বিভিন্ন ধরনের চাঁদা দিয়ে থাকে। যেমন "ওসীয়্যতের" চাঁদা। তাদের আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ কিংবা তার চেয়েও বেশী চাঁদা দিতে হয়। আর "যাকাত" তো মাত্র চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হয়। অনুরূপভাবে আহমদীদেরকে এমটিএ-র চাঁদা দিতে হয়, গরীব লোকের কল্যাণের জন্য চাঁদা দিতে হয়, তবলীগের জন্য চাঁদা দিতে হয়। ওয়াক্ফে জাদীদ, তাহ্রীকে জাদীদ-এর জন্য চাঁদা দিতে হয়। এ রকম অনেক ধরনের চাঁদা আছে আমাদের জামাতের। তাই জামাতের সাথে তুলনা করলে এর কোন তুলনাই সম্ভব নয়।

হুযূর বলেন, যদি "বোঝা" শব্দটি ব্যবহার করা হয় তাহলে আহমদীদের চাঁদাকে "বোঝা" বলা যেতে পারে। কিন্তু আহমদীরা চাঁদাকে "বোঝা" মনে করে না। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে চাঁদা দিয়ে থাকেন এবং প্রফুল্ল হৃদয় জামাতের ও ইসলামের সেবার জন্য চাঁদা দিয়ে থাকেন। যদি কোন সময় কোন আহমদীকে শাস্তিস্বরূপ বলা হয় যে, তুমি একটা অন্যায় বা অপরাধ করেছ

তাই তোমার কাছ থেকে চাঁদা গ্রহণ করা হবে না তাহলে সে আহমদী কাঁদে এবং ক্ষমা চায় যে, আমার ভুল হয়ে গেছে। হুযূর বলেন, তাই আমাদের জামাতের চাঁদাকে "বোঝা" বলা যাবে না। যদিও কোন কোন চাঁদাকে আমরা আবশ্যিক চাঁদা আবার কোন কোন চাঁদাকে বলি এটা আবশ্যিক চাঁদা নয় এটা ঐচ্ছিক। কিন্তু সত্যিকার অর্থে সকল প্রকার চাঁদাই স্বতঃস্ফূর্ত চাঁদা হয়ে থাকে।

পঞ্চম প্রশ্ন ঃ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী জনাব অটল বিহারী বাজপাই-এর মধ্যে যে শীর্ষ বৈঠক আসন্ন হুযূর-এর সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করবেন কি?

হুযূর বলেন, পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী জনাব বাজপাই-এর মধ্যে যে শীষ বৈঠক হতে যাচ্ছে এ বৈঠকের পূর্বেই হয়তো একটা সমাধান সামনে এসে গেছে আর এ সমাধানটা তারা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করছে না। হয়তো আমেরিকার চাপে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে। এটা হুযূরের অনুমান। তিনি বলেন, যদি এরকম কোন সিদ্ধান্ত না হয়ে থাকে তো এ শীর্ষ বৈঠক থেকে কোন ফল পাওয়া যাবে না। এটা অর্থহীন হবে। কোন সমাধান সামনে আসবে না।

হুযূর বলেন, আমেরিকার মতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হ'ল- আজাদ কাশ্মীর, যেটা পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সে আজাদ কাশ্মীরকে পুরোপুরি পাকিস্তানকে দিয়ে দেয়া আর জম্মু ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ভারতকে দিয়ে দেয়া। কাশ্মীরের উপত্যকা বা মূল অংশ সেটা আমরিকার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। হয়তো সেখানে একটা এমন সরকার বসানো হবে যে সরকার আমরিকার ইঙ্গিতে চলবে। হুযূর বলছেন, এ মীমাংসা আমেরিকার পক্ষ থেকে সম্ভবতঃ হয়ে গেছে। আর যদি এ রকম কোন সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত না হয়ে থাকে তবে এ শীর্ষ বৈঠকে কোন ফল হবে না এবং কাশ্মীর সমস্যার কোন সমাধান সামনে আসবে না। হুযূর বলেন, যদি আমেরিকার সমাধান সামনে আসে তা হলেও উভয় পক্ষের অর্থাৎ পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে ও ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। হুযূর বলেন, আমি জানি না এমতাবস্থায় দু'দেশের সরকার নিজ নিজ দেশের জনগণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কিনা।

হুযূর আরও বলেন, এ ব্যাপারে একটা তৃতীয় সম্ভাবনাও আছে। দু'দেশের সামরিক খাতে যে বিপুল সামরিক বাজেট কাশ্মীর সমস্যার জন্য অনুৎপাদনশীল খাতে খরচ হচ্ছে যদি দু'দেশ সে অপচয় বন্ধ করতে চায় তবে তারা কাশ্মীর উপত্যকায়ে একটা "রেফারেন্ডাম" (গণ রায়) অনুষ্ঠিত করতে পারে। এটা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে হবে এবং কাশ্মীরবাসী ভোট দেবে, তারা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হতে চায় না কি ভারতের সাথে যুক্ত হতে চায়। তারা অবশ্যই পাকিস্তানের পক্ষেই রায় দেবে। তার মানে বিদ্রোহ হবে ভারতীয় কাশ্মীরে। পাকিস্তান সে পরিস্থিতিতে খুশী হবে। যদি এরকম হয় তবে সমস্যা হবে ভারতের জন্য এবং ভারত সরকার তাদের জনগণকে বোঝাতে পারে যে, আমরা "রেফারেন্ডাম" করেছিলাম আপনাদের মঙ্গলের জন্যই, গরীবদের ভালোর জন্য! ভারতীয় সরকার যদি নিজের দেশবাসীকে বোঝাতে সক্ষম হয় তো জনগণ সমাধানটা মেনে নিবে। বিপ্লব বা গণ-আন্দোলন তৃণমূল পর্যায়ে থেকেই সংঘটিত হয়। যদি গরীব লোক সরকারকে সমর্থন করে তাহলে কোন বড় রকম গন্ডগোল হবে না।

ষষ্ঠ প্রশ্ন ঃ যদি কারও ঋণ থাকে তো বেতন পেলে সে আগে ঋণ শোধ করবে, না কি চাঁদা আগে দেবে?

হুযূর বলেন, যে ব্যক্তি ঋণ করেছে সে তো নিজের সুবিধার জন্য ঋণ করেছে। তাই মাসের শেষে যখন সে বেতন পায় তাকে অবশ্যই হিসাব করে চাঁদা দিতে হবে। হুযূর মূলতঃ এ বিষয়ে আরও আলোচনা করেছেন যে, ব্যাংক থেকে এভাবে টাকা নেয়া, খরচ করা দেওলিয়া হয়ে যাওয়ার শামেল। এ ধরনের বিষয়গুলোকে হুযূর মোটেই উৎসাহিত করেন না। হুযূর বলেন, মানুষ এভাবে এমন টাকা খরচ করে যা কিনা তার ভবিষ্যত থেকে নিয়ে বর্তমানের জন্য খরচ করার শামিল। সে এমন টাকা খরচ করে যা সে এখনও আয় করে নি। কাল্পনিকভাবে সে মনে করে তার ভবিষ্যতে এত আয় হবে আর সেই আয়কে সামনে রেখে সে বর্তমানে খরচ করা আরম্ভ করে। হুযূর বলেন, এটি কোনভাবে ঠিক নয়। এটি আমি পসন্দ করি না। শুধু এক ক্ষেত্রে আপনি এমন কাজ করতে পারেন আর সেটা হ'ল বাড়ী কেনার জন্য। ঋণ করে বাড়ী ক্রয় করা যেতে পারে কারণ সে যখন কিস্তিতে ঋণ শোধ করবে তো বাড়ীটা তার নিজের হয়ে যাবে। এটা তার ভবিষ্যতের জন্য এক ধরনের সঞ্চয় হচ্ছে। এখন একজন প্রশ্ন করেছেন যে, ব্যবসায়ের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ করা ঠিক কিনা। এর উত্তর হচ্ছে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ঋণ নিতে হয়। সঠিক ঋণ হ'ল তা যা আপনার (মর্গেজকৃত) সম্পত্তি থেকে পরিমাণে কম হয়। আপনি যদি নিজের সম্পত্তির তুলনায় অনেক বেশী ঋণ নিয়ে ফেলেন তাহলে আপনি তো দেউলিয়া হয়ে যাবেন। প্রতারণার আশ্রয় নেয়াটা কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।

সপ্তম প্রশ্ন ঃ হুযূর আমি মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর একটি বইতে পড়েছি, আল্লাহ্ এর যিক্‌র করার সময় গণনা করা ঠিক নয় যে, কয়বার সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্ এবং আল্লাহু আকবর বলা হ'ল। কিন্তু আবার অন্য সময় আহমদীরা তাস্‌বীহ ব্যবহার করে গুণে গুণেও যিক্‌রে ইলাহী করেন। কোন্ পদ্ধতিটা সঠিক?

হুযূর বলেন, তস্‌বীহ করার সময় যখন মানুষ গুণতে আরম্ভ করে যে, এতবার সুবহানাল্লাহ্ এতবার আল্‌হামদুল্লিাহ্ ইত্যাদি বলা হ'ল এজন্য মানুষ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার চেয়ে গনণার দিকেই বেশী মনোযোগ দিয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র দিকে দৃষ্টি কম থাকে সে কারণে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) গুণে গুণে তস্‌বীহ করাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তদ্‌সত্ত্বেও আমরা হাদীসে দেখি যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, তোমরা এতবার করে সুবহানাল্লাহ্ বল, এতবার আল্‌-হাম্‌দুলিল্লাহ্ বল এই দুই ধরনের উক্তির সমাধান হচ্ছে আপনি অবশ্যই যিকরে ইলাহী করুন কিন্তু দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন আল্লাহ্‌র স্মরণে। দৃষ্টি যেন সংখ্যার ওপরে না থাকে।

অষ্টম প্রশ্ন ঃ হযরত লুক্‌মান (আঃ)-এর সম্পর্কে কিছু বলবেন কি? হুযূর বলেন, তার ব্যাপারে মতের ভিন্নতা রয়েছে। তিনি শ্বেতাঙ্গ ছিলেন না কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন। একটি কথা নিশ্চিৎ যে, তিনি শেতাঙ্গ ছিলেন না। তিনি কৃষ্ণাঙ্গ লোকদের মধ্যে এক মহান ব্যক্তি ছিলেন এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। কুরআন করীমেও তাঁর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যা বলেছেন

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলেছেন। আল্লাহ্ তাঁকে ঐসব কথা শিখিয়ে ছিলেন। হুযূর বলেন, তিনি আসলে কোথাকার লোক ছিলেন শেতাঙ্গ না কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূণ হচ্ছে তার শিক্ষা এবং উপদেশাবলী। কুরআনে তাঁর শিক্ষা উল্লেখিত রয়েছে যা পালন করা হবে সবচে' ভাল কাজ।

নবম প্রশ্ন ঃ বিতর নামায কি নফল না অন্য কিছু?

হুযূর বলেন, বিতর নফল নামায। এটি বেজোড়। রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌তাআলা বেজোড়কে পসন্দ করেন। সে হিসাবেই ইসলামী ইবাদতের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। দিনের ফরয নামাযগুলো যোগ করলে জোড় সংখ্যা পাওয়া যায় কিন্তু মাগ্‌রিব এর নামায হ'ল তিন রাকাআত, অর্থাৎ বেজোড়। এটিকে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় না। সারা দিনের ফরয নামাযের মাঝে মাগরিব এর তিন রাকাআতকে যোগ করলে যোগফল হবে বেজোড়। অনুরূপভাবে নফল ইবাদত সারা দিনে যা পড়া হয় সেটাও জোড় এবং তার সাথে ইশা'র নামাযের পর বিতর নামাযের তিন রাকাআত যোগ করলে যোগফল হবে বেজোড়। এ থেকে ইসলামী ইবাদতের প্রজ্ঞা বুঝা যায়।

দশম প্রশ্ন ঃ "মাক্‌রূহ" কাকে বলে?

হুযূর বলেন, "মাক্‌রূহ" অর্থাৎ অপসন্দনীয় হচ্ছে হালাল এবং হারামের মাঝামাঝি। একটি জিনিস হারাম বা নিষিদ্ধ হতে পারে আবার অন্য একটি জিনিষ পুরোপুরি হালাল এবং তাইয়্যেব হতে পারে যার ব্যবহার উৎসাহিত করা হয়। এ দুইয়ের মাঝে অর্থাৎ হারাম এবং হালালের মাঝে "মাক্‌রূহ" বস্তু থাকতে পারে। এটা অপসন্দনীয় জিনিষ। কোন কোন বস্তু আছে যেটা হালাল কিন্তু তাইয়্যেব না-ও হ'তে পারে। হযরত রসূলে করীম শুধু হালাল বস্তুই খেতেন না তিনি হালাল এবং "তাইয়্যেব" বস্তু খেতেন। অর্থাৎ উন্নত মানের হালাল বস্তু খেতেন যাকে উৎকৃষ্ট বস্তু বলা যায়। একবার রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে কয়েকজন সাহাবা গুই সাপের মাংস খাচ্ছিলেন এবং তারা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কেও দিলেন যে, আপনিও আমাদের সাথে খান; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, না আমি এটা খাব না। সাহাবারা তখন ভাবলেন যে, তাঁরা হারাম জিনিষ খাচ্ছেন না কি? তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, এটি হারাম নয় কিন্তু আমার জন্য এটি তাইয়্যেব বা রুচিকর নয়।

একাদশ প্রশ্ন ঃ হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ) -এর সম্পর্কে চাচাও হতেন। তাঁর সংগে তার বিয়ে হয়েছিল। এটার সম্বন্ধে আলোকপাত করবেন কি?

হুযূর বলেন, হযরত আলী (রাঃ) বিবি ফাতিমা (রাঃ)-এর সরাসরি চাচা ছিলেন না তিনি চাচাতো চাচা ছিলেন। এরকম সম্পর্ক থাকলে বিয়ে হতে পারে।

দ্বাদশ প্রশ্ন ঃ একটা আহমদী দেশে যখন সংসদের নির্বাচন হবে এখন মেয়েরা ভোট দিতে পারবে কিনা? এবং মেয়েরা প্রধান মন্ত্রী হতে পারবে কিনা?

হুযূর বলেন, বাইরের নির্বাচনে যেমন ইংল্যান্ডে বা অন্য দেশে মহিলারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু আমাদের জামাতের বিভিন্ন পদের শীর্ষে পুরুষরা থাকে সেখানে মহিলারা পুরুষদের নির্বাচনে ভোট দিতে পারে না এবং কোন পদও গ্রহণ করতে পারে না।

ত্রয়োদশ প্রশ্ন ঃ হুযূর আপনি কীভাবে সাঁতার শিখেছিলেন? আপনার সাঁতারের সম্বন্ধে কোন ঘটনা বলবেন কি?

হুযূর বলেন, কাদিয়ানের কাছে দু'টি খাল ছিল সেখানে আমরা প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে যেতাম এবং সাঁতার শিখতাম। কাদিয়ানের স্কুলে বৃহস্পতিবারে অর্ধেক দিন লেখাপড়া হ'ত তারপর আমরা খালে গিয়ে সাতাঁর কাটতাম। জুমুআর দিন স্কুল বন্ধ থাকতো; কিন্তু সেদিন জুমুআর নামাযে যেতে হ'ত তাই সাঁতারের জন্য যাওয়া সম্ভব হ'ত না। আমাদের জন্য সাঁতার শেখাবার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তীতে কাদিয়ানে সাঁতারের জন্য একটা ভাল সুইমিংপুল নির্মাণ করা হয়েছিল। এটা স্কুল ও কলেজের পাসেই বানানো হয়েছিল। সেখানে আমরা নিয়মিত সাঁতারের অনুশীলন করতাম। আর তখন সবচে' ভাল সাঁতারু ছিলেন একজন বাঙ্গালী ছাত্র মুসলেহুদ্দীন খাদেম সাহেব। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রামে থাকেন।

চতুর্দশ প্রশ্ন ঃ ফুলগুলো এত সুন্দর হয় কেন?

হুযূর বলেন, আল্লাহ্‌তাআলা এ পৃথিবীকে সৌন্দর্য প্রদানের জন্য সুন্দর সুন্দর ফুল সৃষ্টি করেছেন। এটা আল্লাহ্'র বিশেষ দান।

পঞ্চদশ প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্‌তাআলা আওওয়াল্ এবং আখের এদিকে বেহেশত্ চিরস্থায়ী তো আল্লাহ আখের হওয়ার সাথে বেহেশ্‌ত চিরস্থায়ী হওয়ার মধ্যে কী সম্পর্ক আছে?

হুযূর বলছেন, এ প্রশ্ন পুর্বেও বহুবার জিজ্ঞেস করা হয়েছে। বেহেশ্‌ত যদি চিরস্থায়ী আর আল্লাহ্‌তাআলা যদি আখের হন তাহলে জান্নাতও আল্লাহ্‌র মত আখের হয়ে যায়। এই ধারণা ঠিক নয়। আল্লাহ্ জান্নাতকে যতটুক স্থায়িত্ব দিয়েছেন ততটুকুই এটা পাবে। হুযূর বলেন, তাই আমার জন্য এখানে কোন সমস্যা নেই। অন্যেরা জানি না কেন সমস্যায় পড়ে। যিনি চিরস্থায়ী তিনি জান্নাতকে স্থায়িত্ব দিয়েছেন। জান্নাত নিজে এটা লাভ করতে পারে নি। হুযূর বলেন, সাধারণ মানুষের ধারণা যে জান্নাত এমন একটি জায়গা যেখানে সব কিছু একই রকম স্থির থাকবে; এটাও ঠিক নয়। এমন হলে তো জান্নাতবাসীরা একঘেঁয়েমী অনুভব করবে যাকে ইংরেজীতে BORING বলা হয়। আসলে জান্নাতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকবে। জান্নাতের পরিবেশ পরিবর্তন করবে এবং জান্নাতবাসীদের অবস্থা উন্নত থেকে উন্নততর হতে থাকবে।

অতএব জান্নাতের সম্পর্কে যে 'আখের' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ওটা রূপক অর্থে বলা হয়েছে। রসূল করীম (সঃ) সম্বন্ধে কুরআন করীমে এসেছে 'তোমার প্রত্যেকটি পরবর্তী পদক্ষেপ তোমার পূর্ববর্তী পদক্ষেপের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর হবে'। হুযূর বলেন, জান্নাতের 'আখের' বলতে কিছু নেই। এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়। 'আখের' তাই শুধু আল্লাহ্‌তাআলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্য কোন মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয় বা জান্নাতের জন্যও ধরা যাবে না যে, জান্নাত নিজের বলেই বা নিজের গুণেই আখের হয়েছে। শুধু আল্লাহ্‌তাআলার করুণার বরাতে জান্নাত নিজের উন্নত মর্যাদা লাভ করেছে।

ষষ্ঠদশ প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন চিকিৎসার পদ্ধতির মধ্যে কোন পদ্ধতি আপনার বেশী পসন্দ? আর চিকিৎসা ক্ষেত্র একাধিক পদ্ধতি এক সংগে নেয়া নিরাপদ বলে কি আপনি মনে করেন?

হুযূর বলেন, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি সব চাইতে ভাল।

সংকলন ও অনুবাদ- আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

হাদীস, ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

- মালিক সইফুর রহমান
সাবেক মুফতি সিলসিলাহ্ আহমদীয়া

আদম সন্তান-মুকুট, রসূল-শ্রেষ্ঠ খাতামুন্নবীঈন মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্‌তাআলা চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আবির্ভূত করেন। তাঁহার উপর তাঁহার 'কালাম' নাযিল করেন, যাহা কুরআন করীমের আকারে মুসলমানগণের সর্বাপেক্ষা পবিত্র কিতাবরূপে বিদ্যমান।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের দুইটি মহা দায়িত্ব ছিল। এক, আল্লাহ্‌তাআলার বাণী, তাঁহার বার্তা প্রচার। যাহার প্রতি নিম্ন প্রদত্ত মহামান্য আয়াতে ইশারা করা হয়েছে ঃ

"হে রসূল, তোমার রব্বের তরফ হইতে যে (বাণী) তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা (লোকের) নিকট পৌঁছাও এবং যদি তুমি (ইহা) না কর, তবে (যেন) তুমি তাঁহার 'পয়গাম, তাঁহার বার্তা কিছুই পৌঁছাও নাই" (মায়েদা ঃ ৬৭)।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় কার্য 'কালাম ইলাহী' অর্থাৎ, কুরআন করীমের শিক্ষা ও ব্যাখ্যা দান, যাহা 'সুন্নত' ও 'হাদীসের' আকারে সংগৃহীত এবং মুহাম্মাদী উম্মতে স্বীকৃত ও সুখ্যাত। কুরআন করীমের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে হুযূর (সঃ)-এর এই পদমর্যাদাকেই প্রকাশ করা হইয়াছে ঃ

"এবং তোমার প্রতি আমরা এই পূর্ণ উপদেশ বাণী অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি মানুষের নিকট তাহা স্পষ্ট করিয়া দাও যাহা (তোমার মাধ্যমে) তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে, এবং যেন তাহারা তাহা নিয়া চিন্তা করে" (নাহল ঃ ৪৫)।

সুতরাং হুযূর আলায়হেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম কালাম-ইলাহী পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাক্য ও কার্য দ্বারা ইহার যে ব্যাখ্যা (তশ্‌রীহ ও তফসীর) দান করিয়াছেন, তাহা উম্মতের জন্য তেমনি পালনীয় যেমন কুরআন করীমের অনুবর্তিতা অপরিহার্য। আল্লাহ্‌তাআলা ফরমাইয়াছেন ঃ অর্থাৎ, "এই রসূল তোমাদিগকে যাহা দেন তাহা নিয়া নাও এবং যাহা হইতে বারণ করেন তাহা হইতে বিরত হও" (হাশর ঃ ৮)। এই আয়াতে করীমা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, কুরআন ছাড়াও আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক কার্য-ধর্মের ব্যাখ্যার সহিত যাহার সম্বন্ধ তাহা স্বীকার্য। তাহা পালন করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা মুসলিম জাতির জন্য ফরয। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবা কেরাম রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুম, যাঁহারা তাঁহার নবুওতের আলোকময় গৃহে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাঁহারা ইসলাম ধর্মের আমানতদার এবং কুরআন করীমের প্রচার ও প্রসারের ভার-বাহক ছিলেন, তাঁহারা হুযূর আলায়হেস সালাতু ওয়াস্ সালামের সকল কাজ ও কথার মর্যাদা উপলব্ধি করিয়া ছিলেন। সুন্নতের পায়রবী তাঁহাদের ঈমানের অঙ্গীভূত ছিল। তাঁহারা তাঁহার (সঃ) ইরশাদ সমূহের জ্ঞান লাভকে মুক্তির উপায় বলিয়া জানিতেন। যেমন দেখা যায়, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর যখনই কোনো গুরু বিষয় তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইত তখন তাঁহারা কুরআন করীম হইতে পথ-প্রাপ্তি অন্বেষণ করিতেন। যদি তাঁহারা এ বিষয়ে পবিত্র কালামে কোনো বিশদ উক্তি ধরিতে না পারিতেন, তবে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ইরশাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন। যখন তাঁহারা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য উপায়ে জানিতে পারিতেন যে, হুযূর আলায়হেস সালাতু ওয়াস্‌সালামের কোনো বাণী তৎ-সম্পর্কে আছে, তখন তাঁহারা তাহা কায়মনোবাক্যে সর্বতঃ মাথা পাতিয়া পালন করিতেন এবং স্বকীয় অভিমত অনুযায়ী চলা গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতা বলিয়া জানিতেন। এমন কি, যখন কোনো প্রভাবশালী সাহাবী কোনো গুরুতর বিষয়ে স্পষ্ট আয়াত বা স্পষ্ট হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞাত না হওয়ায় স্বীয় 'ইজতিহাদ' বা অভিমত ও বিবেচনা দ্বারা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন এবং পরে তিনি জানিতে পারিতেন যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও তদনুরূপ ইরশাদই ফরমাইয়াছেন, তখন তাহাতে তিনি এত আনন্দ পাইতেন ও খুশি হইতেন, যেন পৃথিবীর কোন মহা ধন-ভান্ডার তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ঐশী অনুগ্রহে অমূল্য নেয়ামত লাভ করিয়াছেন। স্বয়ং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন হযরত মায়ায বিন জবলকে (রাযিঃ) ইয়ামেনের শাসনকর্তা করে প্রেরণ করেন, তখন তিনি (সঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ 'শাসনভার কীরূপে নির্বাহ করিবে?" তিনি (রাঃ) নিবেদন করিলেন ঃ "কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে ফয়সালা করিব। যদি হেদায়াতের (পথ-প্রাপ্তির) এই উভয় উপায়েই পথ দর্শন না করি, তবে আপনার (সঃ) সাহচর্যের কল্যাণে যে ধর্মীয় শিক্ষা, দীনী তরবিয়ত লাভ করিয়াছি উহার আলোকে স্বীয় অভিমত ও বিচার-শক্তি দ্বারা সমস্যার সমাধান করিব।" তিনি (সঃ) হযরত মায়ায (রাযি)-এর এই বিবৃতি শ্রবণে সন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন এবং এই বলিয়া খোদাতাআলার শোকর আদায় করিলেন যে, তিনি তাঁহার (সঃ) নির্বাচিত শাসনকর্তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়াছেন [মুস্‌নাদে আহমদ, ৫ম খন্ড, ২৩০ পৃঃ)।

তারপর এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির সম্পর্কে আরো এক দৃষ্টিকোণ হইতে আমরা চিন্তা করিতে পারি। উপরে আমি বলিয়া আসিয়াছি যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দুইটি কাজ। এক, 'কালাম ইলাহী' অর্থাৎ কুরআন পাক পৌঁছান, পড়ান ও শিখান। দুই, ইহার যুক্তি-প্রমাণ স্পষ্ট করিয়া তোলা এবং ব্যাখ্যা দান। অন্য কথায় তাঁহার (সঃ) পদ-মর্যাদা ছিল রসূল হওয়ারও এবং 'মুবাইয়েন' ব্যাখ্যাকারী হওয়ারও। কুরআন করীম ধর্ম-শিক্ষা দানের মূল উৎস ছিল বলিয়া মৌখিক শিক্ষা দান ছাড়াও তিনি (সঃ) ইহা লিখারও পুরাপুরি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তারপর সাহাবারাও (রাযিঃ) এই কালাম-পাক সংরক্ষণ, ইহার হিফাযতের হক পূর্ণ করেন এবং তাহাদের এই মহা গুরু-দায়িত্ব এরূপ মহাগৌরবান্বিত উপায়ে পালন করেন যে, পৃথিবী ব্যাপী তুমুল ধন্যবাদ প্রবাহ ছুটিল এবং বিস্ময়ের নেত্রে সকলে চাহিয়া রহিল। তবে কি এহেন কর্তব্যবোধে পূর্ণ জাতির নিকট এই আশঙ্কা করা যাইত যে, তাঁহারা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অপর গুরু দায়িত্ব অর্থাৎ তাঁহার (সঃ) বাণী, বচন ও ইরশাদসমূহ ভুলিয়া যাওয়ার ও নষ্ট হওয়ার দিতেন? এইগুলির সংরক্ষণ ও ইহাদের হিফাযত এবং উম্মতের ভবিষ্যৎ বংশাবলীর নিকট পৌঁছানোর কোনো বিশেষ ব্যবস্থা করিতেন না? যাহার প্রতি সাধারণ অপেক্ষাও

সাধারণ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও প্রেম থাকে, মানুষ তাহার প্রতিটি কথা শুধু স্মরণই রাখে না, বরং সকলকেই শোনাইয়া বেড়ায়। তবে কি সেই আত্মোৎসর্গকারী সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম যাঁহারা তাহাদের গুরু, তাঁহাদের পথ-প্রদর্শক (সঃ)-এর প্রতি এরূপ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, উহার নজীর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাঁহাদের নিকট ইহা আশা করা যাইত যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয় উপদেষ্টার প্রিয় কথামৃত অবহেলা বা উপেক্ষার কোটরে সসর্পণ হইতে দিতেন? মানুষকে তাহা শুনাইবার কোনো ব্যবস্থা করিতেন না? তারপর যদি সাহাবা (রাযিঃ) তাঁহার (সঃ) কথামৃত ঈমান আনয়নকারীদিগকে শোনাইয়া ছিলেন, পরবর্তীদের নিকট পৌছাইয়া ছিলেন এবং ইহাতে কোনো ত্রুটি বা শৈথিল্য হইতে দেন নাই, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই কথামৃত কোথায় গেল? 'সুন্নত' ও 'হাদীস' ছাড়া রচনাবলীর এমন কোন পুস্তক পৃথিবীতে নাই, যাহার মধ্যে 'সরওয়ারে-কায়েনাৎ' সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের ইরশাদসমূহ এবং তাঁহার প্রিয় কথামৃত সন্নিবিষ্ট আছে। সুতরাং সুন্নত ও হাদীস অস্বীকার মুলতঃ ঐ সকল লোকেই করিতে পারে যাহারা হয়ত তাঁহার পদমর্যাদা মানে না যে, তিনি (সঃ) কুরআন প্রচারক (মুবাল্লিগ) হওয়া ছাড়াও তিনি হইলেন কুরআন-তত্ত্ব প্রকাশক– 'মুবাইয়েন' রসূল হওয়ার দিক হইতে এই দুই পদই তাঁহার (সঃ) আছে। নতুবা তাহারা হয় ত মনে করে যে, নাউযুবিল্লাহ্, তিনি কুরআন স্পষ্ট করিয়া ধরার দায়-দায়িত্ব পালনই করেন নাই, কিংবা সাহাবা (রাযিঃ) নাউযুবিল্লাহ্ তাহাদের কর্তব্য উপলব্ধি করেন নাই এবং তাঁহার কথামৃত, পুণ্য ইরশাদসমূহ নষ্ট হইতে দিয়েছিলেন এবং উম্মত পর্যন্ত পৌছাইবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। যেহেতু এই তিন কথাই প্রথম বিচারেই ভুল, তখন রসূলের (সঃ) আহাদীস অস্বীকার ব্যতীত এই ধারণার অন্য কোনো মানে নাই। হয়ত ঐ সব লোকের বুদ্ধির ত্রুটি আছে বা তাহারা ধর্ম হইতে আজাদী চায় এবং তাহারা যথেচ্ছাচার প্রয়াসী।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, কোনো কোনো সাব্বিবেচনার ফলে প্রথম সময়ে আহাদীস লিখা এবং গ্রন্থাকারে ঐগুলি সংগৃহীত করিবার সমষ্টিগত ব্যবস্থা সাহাবাগণ (রাযিঃ) সে প্রকারে করেন নাই যে প্রকারে কুরআন করীম লিখার এবং বিভিন্ন এলাকায় উহার বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য অনুলিপি প্রেরণের ব্যবস্থায় করিয়াছিলেন। ইহার এক অতি গুরু কারণ এই ছিল যে, নব দীক্ষিত মুসলমানগণের জন্য কোনরূপ ভুল বুঝার অবস্থা সৃষ্টি না হয় এবং তাঁহারা অজানার কারণে কোন হাদীসকে কুরআন করীমেরই আয়াত বলিয়া ধরিয়া লইতেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে অনেক সাহাবা (রাযিঃ) হাদীসসমূহ মৌখিক স্মরণ রাখা ছাড়া লিখিয়াও রাখিতেন এবং এই সব পুস্তক ব্যক্তিগতভাবে নিজের কাছে সংরক্ষণ করিতেন এবং প্রয়োজনের সময়ে লোক সমক্ষে ঐগুলি বিশেষ প্রযত্নে বর্ণনা করিতেন। তাবেয়ীগণেরও একই অবস্থা ছিল। আগ্রহ এবং পূর্ণ অভিনিবেশ সহ তাহারা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের ইরশাদ সমূহের সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করিতেন এবং অন্যান্যদের নিকট পৌছাইতেন। তাবা-তাবেয়ীগণের যুগ পর্যন্ত হাদীসের জ্ঞান লাভের স্পৃহা সমগ্র ইসলামী রাষ্ট্রে সাধারণ বিষয়রূপে সার্বজনীন হইয়া পড়ে। প্রত্যেক গৃহেই রসূলের (সঃ) হাদীস চর্চা হইত। হাদীসের বড় বড় ইমাম পয়দা হইলেন। হযরত ইমাম হাসান বসরী (রহঃ), সায়ীদ বিন্ মুসাইয়েব (রহঃ), সায়ীদ বিন জুবায়ের (রহঃ), ইবনে শিহাব যুহ্রী (রহঃ), ইমাম শা'বী (রহঃ), সুফিয়ান সুরী (রহঃ), সুফিয়ান বিন্ আইনিয়াহ (রহঃ) এবং হযরত মালেক (রহঃ)-এর গৌরবান্বিত মর্যাদা এবং হাদীসের খিদমতের আযীমুশ্‌শান কার্যকে কে অস্বীকার করিতে পারে? হাদীসের ইমামগণের পর তাঁহাদের শিষ্যগণ এই জ্ঞানে আরো অনেক উন্নতি করেন। হাদীসের জ্ঞানার্জন ও হাদীস সংগ্রহার্থে তাঁহারা বিভিন্ন দেশ পর্যটন করেন। সকল স্থানেই গমন করেন। হাদীস সংগ্রহপূর্বক ঐগুলিকে গ্রন্থের রূপ দান করেন।গ্রন্থাকারে সংগৃহীত ঐসব হাদীসেরই মধ্যে হযরত ইমাম আহমদ হাম্বলের (রহঃ) নজিরবিহীন কেতাব 'মুস্‌নদে আহ্‌মদ'। ইহা প্রায় ৪০ (চল্লিশ) হাজার হাদীস লইয়া রচিত। অতঃপর আরো ইমামগণ হইয়াছেন। বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার দিক হইতে হাদীসসমূহকে যাচাই করিয়া সযত্নে বিচারপূর্বক এমন সব হাদীস নির্বাচন করেন এবং এমন উত্তম ও কল্যাণময় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যে, ঐগুলিতে বিষয়াবলীর তরতীব ও তত্‌বীক, তথা একের সহিত অপরের সম্বন্ধ ও অন্বয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আহাদীসের বিশুদ্ধতার তুলা-দন্ডের প্রতিও সম্যক পরিশ্রমসহ সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। যেমন হযরত ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহে আলায়হে প্রণীত কিতাব সহীহ্ বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) প্রণীত কিতাব সহীহ্ মুসলিম।

এই সময়েই হাদীসের সত্যতা ও প্রামাণিকতা পরীক্ষার মূল-নীতি ও সূত্র রচিত হয় এবং এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সনদযুক্ত হাদীসের জন্য 'রেওয়ায়াত' ও 'দেরায়াত' উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক।

'রেওয়ায়াত'

'রেওয়ায়াত' দ্বারা বুঝায় গ্রন্থকার যে সব বর্ণনাকারী (রাবী) হইতে 'হাদীস' প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা সংখ্যায় কতজন এবং সততা, সাধুতা, মানসিক শক্তি ও স্মরণ-শক্তির দিক দিয়া তাহাদের মান কী। এই দিক্ দিয়া হাদীসসমূহের নিম্নলিখিত প্রকার নির্ণীত হয়। বর্ণনাকারী রাবীগণের সংখ্যার দিক্ হইতে হাদীসের প্রকার এই ঃ

(১) মুতাওয়াতির - সেই হাদীস্ যাহার অর্থ সম্পূর্ণ স্পষ্ট এবং উহার বর্ণনাকারীগণ এত সঠিক ব্যক্তি যে, মানব-বুদ্ধি তাঁহাদের কাহাকেই মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করিতে প্রস্তুত নহে।

(২) 'মশ্‌হুর' - 'সেই হাদীস, যাহার বর্ণনাকারী 'সনদের' কেনো অংশেই তিন অপেক্ষা কম না।

(৩) 'আযীয' - সেই হাদিস, যাহার 'রাবী' গণের কোনো অংশেই দুই অপেক্ষা কম না।

(৪) গরীব- সেই হাদীস, যাহার 'সনদের' কোনো অংশে কোনো এক বর্ণনাকারী (রাবি) পাওয়া যায় নাই, বাদ পড়িয়াছেন।

রাবী, তথা বর্ণনাকারীগণের গুণাবলীর দিক হইতে হাদীসসমূহের প্রকার ঃ

১। 'সহীহ্' - যে হাদীসের এমন বর্ণনাকারী (রাবীগণ) রহিয়াছেন যাঁহারা 'দিয়ানতদার' সৎ ও বিশ্বস্ত, নামায-রোযার পাবন্দ এবং শরীয়তের নিষেধসমূহ হইতে আত্ম-রক্ষা করিতেন এবং যাঁহাদের স্মরণশক্তি প্রখর ও শক্তিশালী ছিল, বোধশক্তিও অতি উত্তম। আর যে হাদীসের 'সনদ' সংলগ্ন (মুত্তাসিল') ছিল

অর্থাৎ মাঝে কোনো বর্ণনাকারী বা 'রাবী' রহিয়া যান নাই (ছোট্ পড়ে নি)।

২। 'হাসান' - সেই হাদীস, যাহার কোনো 'রাবীর' স্মরণ শক্তিতে কোন অভাব থাকে, কিন্তু অন্য যাবতীয় গুণ পুরাপুরি নির্দোষ নিখুঁত, এবং তাহাতে কোন ত্রুটি নাই।

৩। যয়ীফ (দুর্বল) - সেই হাদীস, যাহার মধ্যে 'সহীহ্' বা 'হাসান' সংযুক্ত শর্তাবলী পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্থলে, হাদীসের রাবী তথা বর্ণনাকারীর সততা ও ধর্মশীলতা সম্বন্ধে কাহারো প্রশ্ন থাকে, 'রাবীর' স্মৃতিশক্তি বিশেষ ভাবে দুর্বল।

৪। 'মউযু' (জাল) - মিথ্যা হাদীস। অর্থাৎ, কোনো কথা ভ্রান্তরূপে বা নিছক মিথ্যা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি আরোপ করা হয়, যাহা তিনি বলেন নাই।

৫। 'মকবুল' (গৃহীত) - ঐ হাদীস, যাহা 'সহীহ্' বা 'হাসান'।

৬। 'মরদূদ' (অগ্রাহ্য) - সেই হাদীস, যাহা 'যয়ীফ' বা 'মউযু'। এরূপ হাদীস অগ্রহণীয়, অগ্রাহ্য।

'সনদ'- দ্বারা হাদীস বর্ণনাকার তথা রাবীগণের সেই শৃঙ্খলকে বুঝায়, 'যাহা হাদীসসমূহের সংগ্রাহক বা কিতাব প্রণেতা পর্যন্ত সেই হাদীস পৌঁছে। দৃষ্টান্তস্থলে, **'ইন্নামাল আঁমালু বিন্ নিয়্যত'**- এই হাদীসের 'সনদ' যাহা ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহে আলায়হে তাঁহার কিতাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহা এই ঃ

"হাদ্দাস্নাল্ হুমাইদী। কালা হাদ্দাসনা সুফ্ইয়ানু। কালা হাদ্দাসনা ইয়াহ্ইয়া বিন্ সায়ীদুল্ আন্সারীউ। কালা আখবারনি মুহাম্মদ বিন্ ইব্রাহিমুৎ তাইমী আন্নাহু সামিয়া আল্কামাতা বিন ওয়াককাসুল্ লাইসী ইয়াকুল সামি'তু উমারুব্নাল্ খাত্তাব রাযীয়াল্লাহু আন্হু আলাল্ মিম্বারে, কালা সামি'তু রসূলাল্লাহে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা ইয়াকুলু "ইন্নামাল্ আমালু বিন্নিয়্যতে" (আল্-হাদীস')।

['আমাদের নিকট হাদীসটি বর্ণনা করিলেন হুমাইদী। তিনি বলিলেন আমাদের নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেন ইয়াহ্ইয়া বিন্ সায়ীদ আল্ আন্সারী। তিনি বলেন ঃ আমাকে অবহিত করেন মুহাম্মদ বিন্ ইবরাহীম আও তাইমী যে, তিনি শোনেন আলাকামা বিন ওয়াককাস্ আল্ লাইসীর নিকট। তিনি বলিতেছেন ঃ আমি শুনিলাম, উমর বিন্ খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরের উপর বলিলেন, আমি শুনিলাম রসূলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ফরমাইতেছেন ঃ "যাবতীয় ধর্ম কর্ম নির্ভর করে সংকল্পের উপর।" - আল হাদীস]

এই উদাহরণে "হাদ্দাস্নাল্ হুমাইদীযু" হইতে লইয়া "ইয়াকূলু" পর্যন্ত সমগ্র এবারত 'সনদ' বলিয়া কথিত হয়। এবং হাদীসটি শুরু হইতেছে 'ইন্নামা' শব্দ হইতে।

সনদের দিক হইতে হাদীসের প্রকার ঃ

১। 'মরফূ'-সেই হাদীস যাহার সনদে হাদীসের সম্পর্ক আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দিকে পৌঁছিয়াছে। যেমন, 'রাবী' (বর্ণনাকারী) বলেন যে, তিনি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট শুনিয়াছেন বা তিনি (সঃ) ইহা ফরমাইয়াছেন, বা তিনি এরূপ করিয়াছেন। উপরোক্ত উদাহরণে ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণিত হাদীসটি 'মরফূ' (উর্দ্ধ গত)।

২। 'মুত্তাসাল' - সেই হাদীস যাহার সনদে ধারাবাহিকতা থাকে, ভঙ্গ হয় না। মাঝে কোনো বর্ণনাকারী তথা 'রাবী' না থাকিয়া যান। ইহারও উদাহরণ উপরোক্ত হাদীস। অন্য কথায় এই হাদীসের 'সনদ' 'মরফু' এবং মুত্তাসাল' দুই-ই। (মুত্তাসাল অর্থ সংলগ্ন)।

৩। 'মুরসাল' - সেই হাদীস যাহার সনদে সাহাবীর উল্লেখ থাকে না। যেমন, এক তাবেয়ী বলিলেন যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এরূপ ফরমাইয়াছেন বা করিয়াছেন।

৪। 'মুনকাতা' - সেই হাদীস যাহার 'সনদে' সাহাবী বাদ না পড়িয়া অন্যান্য কোনো 'রাবী' ছুট পড়িয়াছেন এবং এই প্রকারে ধারাবাহিকতা ব্যাহত হইয়াছে।

হাদীসের কিতাবের প্রকার ঃ

হাদীস গ্রন্থসমূহের রচনা পদ্ধতি, লিখার উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত পরিশ্রম এবং দৃষ্টি-ভঙ্গীর জটিলতার দিক হইতে হাদীস গ্রন্থসমূহকে নানাভাবে বিভাগ করা হইয়াছে। যেমন,

১। 'মুসন্দ' হাদীসের সেই কিতাব, যাহার মধ্যে প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণিত 'আহাদীস' (তথা, হাদীসসমূহ) বিষয়-বস্তুর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পৃথক পৃথক সংগৃহীত। যেমন, প্রথম হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু' বর্ণিত হাদীসগুলি, পরে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসগুলি, অতঃপর হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আন্হু বর্ণিত হাদীসগুলি এবং এই প্রকারে অন্য সাহাবা রেযওয়ানুল্লাহে আন্হুমের বর্ণিত আহাদীস। যেমন, মুস্নদ আহমদ বিভিন্ন সাহাবীগণের (রাযিঃ) 'রেওয়ায়াত' সূত্রে প্রায় ৪০ চল্লিশ হাজার হাদীসের সমষ্টি। ইহার প্রণেতা হযরত ইমাম আহমদ হাম্বল রহমাতুল্লাহে আলায়হে যিনি ১৬৪ চান্দ্র হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ওফাত হয় ২৪১ হিঃ।

২। 'মু'জেম' - হাদীসের ঐ কিতাব, যাহার মধ্যে প্রত্যেক হাদীস অধ্যাপক বা প্রত্যেক শহরের হাদীসসমূহ বিষয়-বস্তুর ভিত্তিক না করিয়া পৃথক অংশে খন্ডে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন, 'মুজেম তিব্রানী'।

৩। 'জামেয়' - ঐ গ্রন্থ যাহার মধ্যে প্রত্যেক বিষয়-বস্তুর হাদীসসমূহ বিশেষ তরতীবসহ বর্ণিত। যেমন, 'আকায়েদ, (ধর্ম-বিশ্বাস), আহ্কাম (আদেশ-নিষেধ) আদাব (আচরণ বিধি, সমাজনীতি), 'তসউফ' (আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান), 'আখলাক' (নীতি-বিজ্ঞান), 'তারিখ (ইতিহাস), তাফসীর (কুরআন করীমের ব্যাখ্যা প্রভৃতি'। যেমন, 'জামেয়' সহীহ বুখারী', জামেয় তিরমিযী'।

৪। 'সুনান' - ঐ কিতাব, যাহার মধ্যে শুধু আহকাম' ও 'আদাব' [আদেশ-নিষেধ ও নিয়মাবলী] সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ, এই সংগ্রহ ফিকাহের অধ্যায় সংক্রান্ত হাদীস লইয়া সাজানো ও লিখিত। যেমন, সুনান আবূ দাউদ, সুনান নিসায়ী'।

৫। 'সাহীহাইন' - বিশুদ্ধতার দিক হইতে খাঁটি হাদীসের দুই অতি বিখ্যাত কিতাব। অর্থাৎ, 'সহীহ্ বুখারী' ও 'সহীহ্ মুসলিম'।

৬। 'সেহাসিত্তা' - সত্য হওয়ার দিক হইতে হাদীসের ছয় মশ্হুর কিতাব অর্থাৎ 'বুখারী,' 'মুস্লিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইব্নে মাজা, নিসায়ী'। এই তালিকায় মুয়াত্তা ইমাম মালেক (রহঃ) সম্বন্ধে পৃথক লিখিত হয় নাই। কারণ, এই কিতাবের সব আহাদীস 'সহীহাইনে' সন্নিবিষ্ট।

সিহাহ্ সিত্তার হাদীস বেত্তা মুহাদ্দিসগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ

১। হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ)

তাঁহার নাম মুহাম্মদ বিন্ ইসমায়ীল বুখারী (রহঃ)। ১৯৪ হিঃ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ওফাত ২৫৬ হিঃ সনে হয়। বুখারাতে বসবাস করিতেন। তিনি ছিলেন হাদীসের হাফেয 'যাহেদ' 'মুত্তাকী' এবং অত্যুচ্চ ইমামুল মুহদ্দেসীন- (হাদীস বিশারদগণের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা,। তাঁহার রচিত কিতাবের নাম 'জামেয়' সহী বুখারী'। সেহেৎ বা বিশুদ্ধতার দিক হইতে এই কিতাব অতুলনীয় সার্বজনীন সমাদর লাভ করে। এমন কি, উম্মতের উলামার তরফ হইতে এই কিতাবকে 'আসহাহুল্ কুতুবি ব'দা কিতাবিল্লাহ্" (আল্লাহর কিতাব ছাড়া যাবতীয় গ্রন্থাপেক্ষা বিশুদ্ধ) বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

২। হযরত ইমাম মুসলিম (রহঃ)

তাঁহার নাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ (রহমতুল্লাহে আলায়হে)। হিজরী ২০২ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ওফাত হয় ২৬১ হিঃ সনে। তিনি নিশাপুরবাসী ছিলেন। হাদীসের সর্বস্বীকৃত ইমাম, তাক্ওয়া এবং ধর্মশীলতায় উচ্চ স্থানীয়, এবং আহাদীসুররসূলের (সঃ) হাফেয ছিলেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম 'সহীহ মুসলিম'। বিষয়-বস্তুর দিক্ হইতে এই কিতাবের হাদীসসমূহের 'তরতীব (সাজনো) অতি উত্তম। কিন্তু ইমাম সাহেব নিজ দিক হইতে অধ্যায় সমূহের কোনো শিরোনাম দেন নাই। বরং 'তরতীব' বা অন্বয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হাদীসসমূহকে বর্ণনা (রেওয়ায়াত') করিয়া গিয়াছেন। 'সহীহ্ বুখারী'র পরেই বিশুদ্ধতা (খাঁটি হাদীস বর্ণনা) হিসাবে সহীহ মুসলিমকে মান্য করা হইয়াছে।

৩। **হযরত ইমাম তিরযিমী (রহঃ)** ঃ তাঁহার নাম মুহাম্মদ বিন্ ঈসা (রহমতুল্লাহে আলায়হে)। ২০৯ হিঃ সন জন্ম গ্রহণ করেন। ২৭৯ হিঃ সনে ওফাত হয়। তুর্কিস্তানের তিরমিয শহরের অধিবাসী ছিলেন। হাদীস বিজ্ঞানে মশহুর ইমাম এবং তাক্ওয়ার দিক হইতে উচ্চ স্থানীয় ছিলেন। তাঁহার কিতাবের নাম 'জামেয় তিরমিযী'। সেহাহ্গুলির মধ্যে ইহা তৃতীয় স্থানীয়। ইমাম তিরমিযী তাহার কিতাবে হাদীস রেওয়ায়াত (বর্ণনা) করিবার সঙ্গে সঙ্গে উলামার মধ্যে উহার স্বীকৃতি এবং বিশুদ্ধতার দিক হইতেও স্থান এবং মূল্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের এই বিশেষত্ব অন্য সব কিতাব হইতে গুরুত্বপূর্ণ।

৪। **হযরত ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ)** তাঁহার নাম 'সুলাইমান বিন্ আশ্অস্'। হিঃ ২০১ সানে জন্ম গ্রহণ করেন। ২৭৫ হিঃ সন ওফাত হয়। তিনি সাজেস্তানবাসী ছিলেন। হাদীস বিজ্ঞানের সর্বমান্য ইমাম এবং ধর্মপরায়ণতা, তাক্ওয়ায় বিখ্যাত ছিলেন। পরে বস্রায় হিজরত করিয়াছিলেন এবং সেখানেই ওফাত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত কিতাবের নাম, 'সুনানে আবি দাউদ'। সেহাহ্গুলির মধ্যে ইহার চতুর্থ স্থান।

৫। **হযরত ইমাম ইব্নে মাজা (রহঃ)** তাঁহার নাম মুহাম্মদ ইবনে মাজা। মাজা তাঁহার মাননীয় পিতার নাম বা উপাধি। ২০৯ হিঃ সন ইরাকের বিখ্যাত কযবীনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৭৫ হিজরীতে ওফাত পান। সর্বমান্য হাদীসের ইমাম এবং তখনকার মশহুর মকবুল বুযূর্গ ছিলেন। তাঁহার প্রণীত কিতাবের নাম সুনান ইব্নে মাজা; সেহাহ্ সিত্তার মধ্যে ইহার পঞ্চম স্থান।

৬। হযরত ইমাম নেসায়ী (রহমতুল্লাহে আলায়হে)। তাঁহার নাম আহমদ ইবন্ শোয়াইব। ২১৫ হিজরী সন জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩০৩ হিজরীতে ওফাত হয়। খুরাসানের বিখ্যাত শহর নেস-বাসী ছিলেন। তাক্ওয়া পরাহেযগারীতে উচ্চ স্থান ছিল। হাদীসের ইমাম হওয়ার সৌভাগ্য হয়। তাঁহার কিতাবের নাম 'সুনান নেসায়ী'। সেহাহ্ সিত্তায় ইহার ষষ্ঠ স্থান।

৭। **হযরত ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহে আলায়হে)**

মালেক বিন্ আনাস তাঁহার নাম। হিঃ ৯৩ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭৯ হিঃ সন ওফাত হয়। মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসী ছিলেন। হাদীস বিজ্ঞানে তাহার স্থান ইমামুল্ মুহাদ্দেসীন' [হাদীসবেত্তাগণের নেতা]। তিনি সব শীর্ষ স্থানীয় মুহাদ্দিসগণের 'শেখ আ'লা প্রধান গুরু। সব উলামা তাঁহার মহান মর্যাদা অবনত মস্তকে স্বীকার করেন। তিনি মদীনাতুর্ রসূলের (সঃ) আলেম হওয়ার মহা সম্মানিত উপাধি লাভ করেন। পরহেযগারী ও তাওয়াক্কুলে অতুলনীয়। তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থ মুয়াত্তা ইমাম মালেক (রহঃ) নামে খ্যাত। হাদীসের কিতাবসমূহের (রহঃ) উহা আদি গ্রন্থ, সর্বপ্রথম কিতাব। এমন কি, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুস্লিম (রহঃ) এই কিতাব তাঁহাদের সহীহাইনে [দুই বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে) স্থান দিয়াছেন।

একটি জরুরী ব্যাখ্যা

ক) মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ইরশাদ (কথামৃত) হাদীস 'কাউলী' এবং তাঁহার (সঃ) কর্ম বা আমল' হাদীস ফেয়লী [কওলী অর্থ বা চানক এবং ফেয়লী' অর্থ ব্যবহারিক] হযূর সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কোনো সাহাবীর এরূপ কাজ বা 'কথা' যাহা তাঁহার (সঃ) সমর্থন লাভ করিয়াছে, 'হাদীস তাকরীরী' নামে অভিহিত।

খ) 'সাহাবী' দ্বারা বুঝায় সেই সৌভাগ্যশালী মুসলমান, যিনি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দর্শন (সাক্ষাৎ) লাভ করিয়া। তাঁহার উপর ঈমান আনেন।

গ) 'তাবায়ী' দ্বারা বুঝায় সেই মুসলমান, যিনি মুসলমান অবস্থায় কোনো সাহাবীকে দেখিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গ ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ঘ) 'তাবা তাবায়ী' দ্বারা বুঝায় ঐ মুসলমান, যিনি ইসলামের অবস্থায় কোনো 'তাবায়-কে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গ ও শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

দেরায়াত

'সনদের' বিশুদ্ধতা (সেহেৎ)-এর সঙ্গে সঙ্গে হাদীস গ্রহীত হওয়ার জন্য উহার 'দেরায়াত' অনুযায়ী হওয়াও জরুরী। 'দেরায়াত' দ্বারা বুঝায় নিম্নোক্ত যুক্তি-সিদ্ধ নিয়মাবলী ঃ

(১) হাদীস কুরআন করীমের কোনো স্পষ্ট বাক্য, ইরশাদ এবং ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় এরূপ কোন স্পষ্ট বিষয় (লাস)-এর বিরোধী না হওয়া।

(২) হাদীস নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের রীতির (সুন্নতের) এবং সাহাবীগণের সামগ্রিক সমষ্টিগত প্রথার বিরুদ্ধ না হওয়া।

(৩) হাদীস দেদীপ্যমান চাক্ষুস বিষয় এবং নিশ্চিত ঘটনার বিরুদ্ধ না হওয়া।

(৪) হাদীস স্পষ্ট যুক্তির বিরুদ্ধ না হওয়া।

আহমদীয়া জামাতের নিকট হাদীসের স্থান

হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম বলেন ঃ

"মুসলমানগণের হাতে ইসলামী হেদায়াতের উপর কায়েম থাকার জন্য তিনটি জিনিষ আছে (১) কুরআন শরীফ, যাহা আল্লাহ্‌র কিতাব। ইহা অপেক্ষা আমাদের হাতে বড় কোন অকাট্য ও সুনিশ্চিত কালাম নাই। উহা খোদার কালাম। উহা সন্দেহ ও অনুমানের দোষাবলী হইতে পবিত্র।

(২) দ্বিতীয়, 'সুন্নত' এবং 'সুন্নত' দ্বারা বুঝায় আমাদের আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ব্যবহারিক নিয়মাচার, অনুষ্ঠান, যাহার মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে এবং প্রথম হইতে কুরআন শরীফের সাথেই জাহের হইয়াছে। এবং সর্বদা সঙ্গে থাকিবে, বা ভাষান্তরে বলিতে পারি যে, কুরআন শরীফ খোদার বাক্য এবং সুন্নত রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কার্য। আদি কাল হইতে আল্লাহ্‌তাআলার ইহাই নিয়ম যখন আম্বিয়া আলায়হিমুস্ সালাম খোদার বাক্য মানুষের হেদায়াতের জন্য আনয়ন করেন, তখন নিজ কর্ম দ্বারা অর্থাৎ ব্যবহারিক উপায়ে সেই বাক্যের ব্যাখ্যা দান করেন, যাহাতে এই বাণী বুঝিতে লোকের সন্দেহ না থাকে। এই বাণী অনুযায়ী তাঁহারাও চলেন এবং অন্যদেরকেও চালিত করেন। দৃষ্টান্তস্থলে, নামাযের জন্য আদেশ হইল, তখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম খোদাতাআলার এই বাণী তাঁহার কার্য দ্বারা দেখাইয়া দিলেন এবং ব্যবহারিক উপায়ে প্রকাশ করিলেন যে ফযরের নামাযের এই এই 'রাকাআত' এবং মাগরিবের এই 'রাকায়াত' এবং অন্য নামাযগুলির এই রাকাআত। স্বহস্তে সহস্র সাহাবা রেয্ওয়ানুল্লাহে তাআলা আনহুমকে এই কর্মের পাবন্দ করিয়া ব্যবহারিক শৃঙ্খল মহাশক্তি দ্বারা কায়েম করিলেন। সুতরাং ব্যবহারিক আদর্শ (আমলী নমুনা) যাহা অদ্যবধি উম্মতে কর্মরূপে প্রতিপাদিত হইয়া দৃশ্য ও অনুভূত। ইহারই নাম সুন্নত।

(৩) হেদায়াতের তৃতীয় উপায় হাদীস, এবং হাদীস দ্বারা বুঝায় আমাদের ঐ সমস্ত চিহ্ন যাহা কাহিনী বা বৃত্তান্তরূপে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রায় দেড় শত বৎসর পরে বিভিন্ন বর্ণনাকারী দ্বারা সংগৃহীত করা হয়। যখনই সাহাবা রেযওয়ানুল্লাহে তাআলা আন্‌হুমের যুগ উত্তীর্ণ হইল, তখন কোনো কোন তাবয়া-তাবেয়ীনের মনের গতি এদিক চালিত করিলেন যে, হাদীসসমূহকেও একত্রিত করা উচিত। তখন হাদীস সংগ্রহ হইল। ইহাতে কোনো সন্দেহ জন্মিতে পারে না যে, অধিকাংশ হাদীস সংগ্রহকারী বড় মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিলেন। তাঁহারা সাধ্যানুসারে হাদীস পর্যালোচনা করেন এবং ঐ হাদীসসমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিতে চাহেন, যাহা তাঁহাদের অভিমতে জালিয়াত ছিল। কোনো সন্দেহযুক্ত, সন্দেহজনক চরিত্রের বর্ণনাকারীর রেওয়ায়াত তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। কঠোর শ্রম সাধনা করেন। কিন্তু তব সব কার্যক্রম সময় পার হওয়ায় গ্রহণ করা হইল। এজন্য ঐ সবই অনুমানের কৌটায়ই রহিল। ইহা সত্ত্বেও ঘোর অবিচার হইবে, যদি এই বলা হয় যে, ঐ সব হাদীসই বৃথা, আসার, অনর্থক এবং মিথ্যা বরং এই হাদীসসমূহকে লিপিবদ্ধ করিতে এত সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল এবং এত গবেষণা ও পরীক্ষা করা হইয়াছিল, যাহার নজীর অন্য ধর্মে পাওয়া যায় না। তবু এরূপ ধারণার বশবর্তী হওয়া ভুল যে, যে পর্যন্ত হাদীস সংগৃহীত হয় নাই, তখন পর্যন্ত লোকে নামাযের 'রাকাআত' জানিত না, বা হজ্জের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে অপরিচিত ছিল। কারণ বিধি-বিধান পালনের ধারাবাহিকতা যাহা 'সুন্নত' দ্বারা তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সব সীমাবন্ধনী ও ইসলামের যাবতীয় ফরয (কর্তব্য) তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিল। এজন্য একথা সম্পূর্ণ সত্য, যদি এই সব হাদীসের কোনো অস্তিত্বই পৃথিবীতে না থাকিত, যাহা বহুকাল পরে সংগৃহীত হইয়াছিল তবে ইসলামের মূল শিক্ষার কোনো ক্ষতি ছিল না। কারণ কুরআন এবং পারস্পর্য অনুশীলন এইসব প্রয়োজন পূণ করিয়াছিল। তথাপি হাদীসসমূহ সেই আলোক আরো বর্দ্ধিত করিল। অন্য কথায় ইসলাম 'নূরুন্ আলা নূর'- আলোর উপর আলোকে পরিণত হইল এবং এই সব হাদীস কুরআন সুন্নতের জন্য সাক্ষ্যরূপে দাঁড়াইল।"

['রিভিউ বর মুবাহাসা চক্রালবীঃ, ২-৩ পৃঃ]

অনুবাদ ঃ আবূ হামেদ মোহাম্মদ আলী আনোয়ার (মরহুম)
ভূতপূর্ব সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী ২৬-৫-৭৬

১। বিষয়-সূচী

যে যে কিতাব হইতে হাওয়ালা গৃহীত ঃ

১। 'সহীহ্ বুখারী' (মকতবা মুস্তাফায়ী, কাশ্মিরী বাজার, লাহোর)

২। 'সহীহ মুসলিম' (খুতবায় মুস্তাফা, আল্‌তাবী, হলবী, মিসর)

৩। 'সুনুন আবূ দাউদ' (খুতবায় আল্ নামী, কানপুর)

৪। 'জামে' তিরমিযী (খুতবা মুজতাবায়ী, দিল্লী)

৫। 'মিশকাত' (ঐ)

৬। 'কানযুলুল উম্মাল'

৭। নিসায়ী', (মকতবা সালফিয়া, লাহোর)

৮। 'দারকুৎনী'

শোক সংবাদ

অতি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত ক্রোড়া-এর প্রেসিডেন্ট সাহেবের বড় ছেলে জনাব এনামুল হক ভূঁইয়া (অনু) গত ২৮/৭/২০০১ ইং বেলা ১১.৩৫ মিনিট গ্রামের বাড়ী হতে নৌকা যোগে আখাউড়া যাওয়ার পথে তিতাস নদীতে নৌকা ডুবে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)

মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৮ বছর। তিনি ১ ছেলে, ৩ ভাই, ১ বোন ও মা-বাবা রেখেছেন। তাঁর রূহের মাগফেরাতের জন্যে ও পরিবারের সকলের সাবরে জামীলের জন্য সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করছি।

- **আবূ নাসের**, কেয়ার টেকার
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

ইমারত ও ইমামতের পদে আবূ বকর (রাঃ)

(দ্বিতীয় কিস্তি)

নবম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের আগের বছর রসূলে খোদা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মদীনায় বিদেশী প্রতিনিধি দলের আগমন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রেক্ষাপটে মক্কায় বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করার জন্যে যেতে পারেন নি। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে 'আমীরুল হজ্জ' নিযুক্ত করেন ও মুসলমানদের একটি বিরাট দল রওয়ানা করিয়ে দেন। মুসলিম বিশ্বে ইহা ছিলো প্রথম স্বাধীনভাবের হজ্জ। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধিত্বে এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) [সীরাতুল হালবিয়া হিজরাতুন্নবী (সঃ)]

বিদায় হজ্জের পূর্বের বছর ১০ হিজরীতে রসূলে করীম (সঃ) অসুস্থ হন এবং নামাযের জন্যে মসজিদে যেতে পারেন নি। তখন নামাযে ইমামতী করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিলো হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযূর (সঃ) যখন হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে ইমামতীর জন্যে নির্দেশ দেন তখন আমি নিবেদন করলাম, হুযূর! তিনি তো কোমল হৃদয়ের মানুষ, হযরত উমর (রাঃ)-কে নির্দেশ করুন। তিনি (সঃ) বল্লেন, 'আবূ বকরকে নামায পড়াবার জন্যে বলো'।

হযরত আয়েশা বলেন, 'পরে আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এ স্ত্রী হযরত হাফসাহ্ (রাঃ)-কে দিয়ে একথা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বলাই। তিনি (সঃ) পরে ঐ জবাবই দিলেন। হযরত হাফসাহ্ (রাঃ) দ্বিতীয়বার নিবেদন করলে বল্লেন, 'তোমরা তো সেই মেয়েলোকই যারা ইউসুফকে ফুসলানোর চেষ্টা করেছিলো। আবূ বকরকে নামায পড়াতে বলো'। একবার স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ বকরের (রাঃ) ইমামতীতে নামায আদায় করেন (বুখারী কিতাবুল মাগাযী)। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর অনুপস্থিতিতে একবার হযরত বিলাল (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ)-কে নামায পড়াতে বলেন। যখন হুজরাতে হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট হযরত উমর (রাঃ)-এর আওয়াজ পৌঁছলো তখন বল্লেন, আবূ বকর কোথায়? আল্লাহ্ ও মুসলমানরা ইহা পসন্দ করেন যেন আবূ বকর নামায পড়ায়। প্রকৃতপক্ষে এসব নির্দেশাদির মধ্যে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর ইমামত ও খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত ছিলো যা কিনা তিনি (রাঃ) পেতে যাচ্ছিলেন।

রসূল (সঃ)-এর ইন্তিকালে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর ভূমিকা

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরে সাহাবা কেরাম (রাঃ) যখন শোকে পাগল পারা হয়ে গেলেন এবং হাজার হাজার বেদুঈন মুরতাদ হলো অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরে গেলো তখন হযরত উমর (রাঃ)-এর ন্যায় মর্যাদাপূর্ণ সাবাহাবীও এ ভুলের শিকার হয়ে গেলেন যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মারা যান নি। আর আবেগ তাড়িত হয়ে একথা ঘোষণা করলেন, যে তাঁর মৃত্যুর ঘোষণা করবে তার মাথা কেটে ফেলবো। এহেন সংকটজনক অবস্থায় আল্লাহ্‌তাআলা হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে পরিপূর্ণ ধৈর্য-স্থৈর্য ও সাহস দান করেন। অথচ তাঁকে সবাই কোমল হৃদয়ের মানুষ মনে করতো যিনি সহজেই কেঁদে ফেলতেন। তিনি সাহাবীদের সম্মেলনস্থলে এসে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর খবর ঘোষণা করে বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপাসনা করে তারা শুনে নিক যে, তাদের খোদা মারা গেছে আর যারা এক-অদ্বিতীয় শরীকবিহীন খোদার উপাসনা করে তারা স্মরণ রাখুক, ঐ খোদা জীবিত আর তাঁর ওপরে কখনও মৃত্যু আসে না। এভাবে তৌহীদের আঁচল ধরে তিনি এ শোক সহ্য করেন এবং মুসলমানদের আশ্রয়স্থলেও পরিণত হন। তিনি সূরাতু আলে ইমরানের এ আয়াত পাঠ করেন- **ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসূলুন ক্বাদ খালাত মিন কাবলিহির রুসুল** - মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তো **একজন রসূলই। আর তাঁর পূর্বে সব রসূল মারা গেছে** – তখন মদীনার সকল লোকের মুখেই এ আয়াত। তারা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পূর্বের সাধারণ নবীদের মৃত্যুকে স্মরণ করে তাঁর মৃত্যুকে স্বীকার করার সাহস পাচ্ছিলো (বুখারী কিতাবুল মাগাযী)।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিলো তাঁর (সঃ) খলীফা নিয়োগ নিয়ে। কোন কোন আনসার নিজের মধ্য থেকে একজন আমীর নিযুক্ত করে নেবার প্রশ্ন উঠায় আর হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত আবূ উবায়দা (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে সাকীফা বনূ সা'দাহ্ নামক স্থানে গেলেন এবং আনসারদের বুঝালেন, হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবূ উবায়দাহ্ (রাঃ)-এর নামে খেলাফতের জন্যে প্রস্তাব করে বয়াতের মাধ্যমে এক হাতে জমা হয়ে যাওয়ার তাহরীক করেন। হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত আবূ উবায়দাহ্ (রাঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট বয়াত নেবার জন্যে আবেদন করেন। কেননা, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সময় তাঁকেই ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। আর এভাবে সকল সাহাবা হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর হাতে একত্র হয়ে যান এবং মুসলমানদের ঐক্য বিধ্বস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায় (তারিখ ইয়া'কূবী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৩, বৈরুতে মুদ্রিত)।

খলীফা হওয়ার পরে তিনি (রাঃ) প্রথম খুতবাতেই খোদাতাআলা কর্তৃক প্রদত্ত

রসূলে করীম (সঃ)-এর সাহাবাগণের জীবন-চরিত

[সিদ্দীকে আকবর হযরত আবূ বকর (রাঃ)]

মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ

সাহস ও শক্তি, মাহাত্ম্য ও শক্তি-মত্তা, জ্ঞান ও সহনশীলতা এবং দৃঢ়তা ও অন্তর্দৃষ্টির প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

" আমাকে তোমাদের বিচারক বানানো হয়েছে। কিন্তু যদি আমি পুণ্যকর্ম করি তাহলে এতে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে আর যদি মন্দ কাজ করি তাহলে আমাকে বাধা দিবে ... তোমাদের দুর্বল ব্যক্তি আমার দৃষ্টিতে শক্তিশালী যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার অধিকার তাকে দেবার ব্যবস্থা না করি। আর তোমাদের শক্তিশালী ব্যক্তি আমার দৃষ্টিতে দুর্বল যতক্ষণ পর্যন্ত তার ওপরে যে দায়িত ন্যস্ত তাথেকে তা আদায় না করি। আমার আনুগত্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করি। আর আমা দ্বারা যদি এমন কোন কাজ সাধিত হয় যাতে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর অবাধ্যতার চিহ্ন প্রকাশিত হয় তখন আমার আনুগত্য করা তোমাদের জন্যে আবশ্যক নয়" (আত্তাবাকাতুল কিবরী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮২-৮৩, বৈরুতে মুদ্রিত)।

কৃতিত্ব ও বিজয় লাভ

হযরত আবূ বকর (রাঃ) খলীফা হওয়ার প্রথম দিকে যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী ও বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করেন ও বলেন যে ব্যক্তি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে একটি উটের রশি যাকাত হিসেবে দিতো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ঐ ব্যক্তি থেকে তা আদায় না করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তার সাথে যুদ্ধ করবো এবং যাকাত আদায় করবো (বুখারী, কিতাবুয্ যাকাত)।

সুতরাং তাঁর (রাঃ) এ প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হলো ও সারা আরব আর একবার পুনরায় যাকাত আদায় করা আরম্ভ করলো। দ্বিতীয়তঃ ধর্মত্যাগী মুরতাদদের শক্তিশালী ফিতনা প্রতিরোধ করা তাঁর একটি বিরাট কৃতিত্ব।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পরে কোন কোন নও মুসলিম গোত্র বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগী বলে ঘোষণা দেয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাদের সাথে যুদ্ধ করেন ও তাদের নির্মূল করেন। তদুপরি এসব সংকটাপন্ন অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নির্দেশানুযায়ী উসামা (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনীও রওয়ানা করে দেন। এতদ্ব্যতিরেকে কুরআন করীমকে একই খন্ডে গ্রন্থবদ্ধ করার মহান কাজের কৃতিত্ব তাঁরই (ফতুহুল বুলদান লি বালাযূরি, মিশরে মুদ্রিত)।

বিজয়ের প্রেক্ষাপটে তাঁর খেলাফতের যুগটি ঐ পবিত্র যুগের অন্তর্ভুক্ত যাতে পরে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভিত্তি রচিত হয়েছিল । সুতরাং তাঁর (রাঃ) পবিত্র যুগেই হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (সাইফুল্লাহ্) এবং তাঁর সাহাবীদের হাতে ইরাক, ইরান ও সিরিয়া বিজিত হয় (ফতুহুল বুলদান লি বালাযূরী, মিশরে মুদ্রিত)।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখেছিলেন, হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁর (সঃ) চে' আড়াই পদক্ষেপ সম্মুখে অগ্রগামী ছিলেন। সুতরাং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ঠিক আড়াই বছর পরে তিনি স্বীয় প্রভু (সঃ)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হন।

বলা হয়ে থাকে যে, তিনি শীতকালে ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করেছিলেন এবং এতে তাঁর জ্বর হয় আর এ জ্বরই তাঁর (রাঃ) মৃত্যুর কারণ।

সোমবার দিন জিজ্ঞেস করেন। আজ কোন দিন। বলা হলো, সোমবার। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কবে ইন্তেকাল করেছিলেন। বলা হলো, সোমবার। সুতরাং তিনিও সোমবার দিনই ওফাত পেলেন (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮)।

পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়তে ওয়া সাল্লাম তাঁকে জান্নাতীদের সর্দার আখ্যায়িত করেন। আর এমনিভাবে ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে তাঁকে প্রথম ধরা হয়ে থাকে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁকে সুসংবাদও শুনিয়েছিলেন, "আপনি আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন (মুস্তাদরাক হাকিম, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৩, মিশরে মুদ্রিত)।

হিজরতের যাত্রা পথে নিজের জীবন বিপন্ন করে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথী হয়েছিলেন। আর কুরআন শরীফেও তাঁকে 'দুজনের মধ্যে দ্বিতীয়' উপাধি দিয়ে আল্লাহ্তাআলার সাহচর্যের শুভসংবাদ শুনানো হয়েছে। আর এ ঐতিহাসিক সাহচর্যে খোদার সন্নিধানে এমনভাবে গ্রহণীয়তা লাভ করেছেন যে, তিনি স্বয়ং উভয় জগতের সৌভাগ্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চিরস্থায়ী সাহচর্যের উত্তরাধিকারীতে পরিণত হয়েছেন। আবার আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আবূ বকরের হাশরও আমার দিক থেকে হবে (মুস্তাদরাক হাকিম, ৩য় পৃষ্ঠা ৬৮, মিশরী ছাপা)।

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর (রাঃ) উচ্চ মর্যাদার কথা বলতে গিয়ে বলেন, কেবল কোন নবীর জন্ম নেয়া ছাড়া আবূ বকর এ উম্মতের উৎকৃষ্ট ও উত্তম ব্যক্তি (জামেউস সগীর লিস্ সাইউতি, পৃষ্ঠা ৫)।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) খুবই অতিথিপরায়ণ নম্র ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। একারণেই হাদীসের পুস্তকে তাঁর বর্ণনা খুব কম এসেছে। কিন্তু তিনি যা বর্ণনা করেছেন এতে তাঁর উচ্চ কৃতিত্ব ও পবিত্র জীবনীর ওপরে বেশ আলোকসম্পাত হয়।

স্বভাবতঃ গম্ভীর হওয়ায় এবং রসূল (সঃ)-এর প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শনের দিক থেকে তিনি নবী করীম (সঃ)-কে খুব কমই প্রশ্ন করতেন। কিন্তু তিনি যে প্রশ্ন করতেন তাতেও তাঁর উচ্চ জ্ঞানের মর্যাদা ও উন্নত চরিত্রের বিকাশ ঘটাত।

আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ ঃ

যদি তাঁর একটি একটি গুণ ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয় তাহলে কয়েক ডজন পুস্তক লেখা যেতে পারে। আল্লাহ্র পথে খরচ করার এ অবস্থা ছিলো যে, তাবূকের অভিযানের সময় তাহরীক করা হলে তিনি ঘরের সমস্ত সম্পদ নিয়ে উপস্থিত করলেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বল্লেন, আবূ বকরের ধন-সম্পদ দ্বারা আমি যে উপকৃত হয়েছি ততটা আর কারও

সম্পদে হই নি (জামেউস সগীর লিস সাইউতি; পৃষ্ঠা ৫)।

বৈধ জীবনোপকরণ অর্জনের প্রতি এত দৃষ্টি রাখতেন যে, খেলাফতের দ্বিতীয় দিনই কাপড়ের গাটরী উঠিয়ে রুজী-রোজগারের জন্যে চল্লেন। তখন রাস্তায় অনেক বিখ্যাত সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁরা বল্লেন, এখন আপনার ব্যয় বায়তুল মাল নির্বাহ করবে। আপনি জাতীয় অন্যান্য দায়িত্বসমূহকে পালন করুন (আত্তাবাকাতুল কিব্‌রী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৪)।

একত্ববাদের তাৎপর্য ঃ

তিনি (রাঃ) পরিপূর্ণ একত্ববাদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। একবার হযরত উসমান গনী বলতে আরম্ভ করলেন হায়! আমি যদি নবী করীম (সঃ)-কে এ কঠিন প্রশ্ন করতে পারতাম তাহলে এর উত্তর জেনে নিতাম-শয়তানী কুপ্রভাবের প্রতিকার কী? হযরত আবূ বকর বললেন, আমি নবী করীম (সঃ)-কে এ প্রশ্ন করেছিলাম। আর তিনি জবাবে বলেছিলেন, কলেমা তৌহীদ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্) পাঠ করে এর ওপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই এমন কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রতিকার (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮)।

অন্য আর এক উপলক্ষ্যে তিনি (সঃ) বলেছিলেন, আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি যে, তোমাদেরকে কলেমা ইখলাস (অর্থাৎ তৌহীদের সাক্ষ্য দেয়া) আর আল্লাহ্‌র ওপরে বিশ্বাস আনার চেয়ে অধিক আর কোন কিছুই দান করা হয় নি (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খন্ড-১, পৃষ্ঠা ৮)।

ইবাদত ও দোয়া

আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সম্পর্কের সর্বোচ্চ মান-দন্ড হচ্ছে তার ইবাদত ও দোয়া। তিনি নিজের ঘরে ছোট একটি মসজিদের ন্যায় তৈরী করে কুরআন পাঠ, ইবাদত এবং যিক্‌রে ইলাহীর (বিভুস্মরণ) মধ্যে কাটাতেন। এ প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। এমন উচ্চ স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করার কারণে তাকে হিজরতের পথ ধরতে বাধ্য করা হয়েছিলো। আর কারাহ্ গোত্রের প্রধান ইবনে দাগনাহ্ তাঁকে ইহা বলে ফিরিয়ে আনলেন, আপনার মত সচ্চরিত্রবান লোককে আমাদের শহর থেকে কীভাবে বের করে দেয়া যেতে পারে? আপনি তো বড়ই দয়ালু, অন্যের বোঝা হালকা করে দেন। অতিথিপরায়ণ, দুঃখ-কষ্টে সাহায্যকারী, আর সিদ্দীকি জীবনের ব্যাপারে এ সাক্ষ্য দিয়ে ইবনে দাগনাহ্ তাঁকে (রাঃ) স্বীয় নিরাপত্তায় পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে এনেছিলেন। সুতরাং তৌহীদের সত্যতার ওপরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমানের কারণে তাঁকে 'সিদ্দীক' বলা হয়ে থাকতো। আর এ গুণকে নবীদের প্রাণের ন্যায় পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে দিয়েছিলো। আসলে এ উৎসই তাঁর (রাঃ) সমস্ত উন্নত গুণাবলীর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক, ভীতি, একাগ্রতা, সততা ও সাহসিকতা প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত ছিলো। হযরত আবূ বকর (রাঃ) প্রসঙ্গে ইবনে দাগনাহ্ কর্তৃক বর্ণনাকৃত গুণাবলী হযরত খদীজা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রথম ওহী লাভের সময় যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন তার সাথে আশ্চর্য রকমের মিল (আল্ আসাবা ফী তামীযুস্ সাহাবা, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৪)।

দোয়ার প্রতিও হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর বিশেষ ঝোঁক ও আকর্ষণ ছিলো। আর স্বীয় উচ্চ উৎসাহ অনুযায়ী এ অন্বেষণে থাকতেন যে, স্বীয় প্রভু-প্রতিপালকের নিকট কি চান ও কীভাবে চান এবং বারে বারে মনের প্রশান্তির জন্যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট জানতে চাইতেন। একবার নিবেদন করলেন, আমাকে নামাযে পাঠ করার জন্যে একটি উত্তম দোয়ার কথা বলে দিন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ দোয়া শিখালেন ঃ

আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাসীরান ফাগফিরলী মাগফিরাতাম্ মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গফুরুর রহীম (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪)। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমি আমার প্রাণের ওপরে অনেক যুলুম করেছি সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো, বিশেষভাবে তোমার সন্নিধান থেকে ক্ষমা করো আর আমার প্রতি অনুগ্রহ করো, নিশ্চয় তুমি পরম ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী।

অন্য এক সময় আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁকে এ দোয়া শিখান ঃ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকাল আফওয়া ওয়াল 'আফীয়াতু ফীদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি (তিরমিযী আবওয়াবুদ্দাওয়াত)।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট পৃথিবী ও আখেরাতের ক্ষমা ও হেফাযতের ভিখারী।

এ কারণেই যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) এ দোয়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে থাকতেন আর বলতেন, ঈমানের পরে হেফাযতের দোয়া থেকে অধিক আর কোন কিছু নেই, অর্থাৎ ঈমানের নিরাপত্তা কামনা করা (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫)। (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

শোক সংবাদ

আমার স্বামী আব্দুল লতিফ খান (প্রফেসর) সাহেব গত জুনের ২২ তারিখ বেলা ১২টা ৪০ মিনিট হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন (ইন্নলিল্লাহে ওয়া ... রাজেউন)।

তিনি ভৈরব জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি কয়েকজন আহমদী, যারা নিজেদের পরিচয় গোপন রেখেছিলেন তাদের ডেকে এনে ভৈরবের জামাত গঠন করেন। তিনি মূসী ছিলেন। তাঁরা তাঁকে প্রেসিডেন্ট মনোনীত করেন।

তাঁর রূহের মাগফেরাতের জন্যে ও তাঁর পরিবারের সাব্‌রে জামীলের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

- রাবেয়া লতিফ
ভৈরব

নবরূপ ইসলামের আত্মকথা

যাঁকে অবলম্বন করে সেদিন পৃথিবীতে আমার প্রথম আগমন সেই মহাত্মা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর তিরোধানের অব্যবহিত পর এতেই নানান ধর্মের অনুসারীগণ নানানভাবে আমার উপর এলজাম দিয়ে আসছে এবং আমার দুর্নাম রটনা করে আমাকে হেনস্তা করার চেষ্টায় প্রাণান্ত রত রয়েছে। এর সাথে আমার নিজ অনুসারীগণের অজ্ঞতা-পূর্ণ কর্মকান্ড এ দুর্নামকে আরও জোরদার করতে একান্তভাবে সহায়তা করেছে। এর জন্য মূলতঃ স্বয়ং আমি দায়ী না হলেও দায়ী ছিল কালের আবর্তন। তবে সেই আবর্তন কাটিয়ে এখন আমি পুনরায় নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছি। এতদিন যারা আমাকে বিবিধ অপবাদ দিয়ে অপমান করার চেষ্টা করেছ তারা সাবধান হও, ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, তোমরা বিগত দিনগুলিতে তোমাদের আত্মার উপর অত্যাচার করেছ। তোমরা নিজ সুপ্রবৃত্তির উপর যুলুম করে স্বীয় আত্মার মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছো। কারণ আমিই কেবল খোদার একমাত্র মনোনীত দীন **(ইন্নাদ্দীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম)** যাতে আত্মসমর্পণ করে বিশ্বমানব স্বর্গ প্রাপ্তির বাসনা করতে পারে। সকল ধর্মের নির্দেশনাগুলি আমাতে সম্পৃক্ত হয়ে তা পূর্ণভাবে পরিণত হয়েছে। এতদিন যাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল তা এখন সন্দেহমুক্ত হয়ে মুত্তাকীদের জন পথ-প্রদর্শক হয়েছে, (২ঃ৩)। বিগত দিনে আগত হযরত ঈসা, মূসা, ইব্রাহীম ও নূহ (আঃ) প্রমুখ যার আগমনপূর্বক পৃথিবী ধন্য হওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন আমিই সেই শান্তির আধার। খোদা প্রদেয় খোদা প্রাপ্তির সরল পথ। আমি বিশ্ব মানবের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ ধর্ম বিধান। আমি স্বর্গালো ও শান্তি সন্ধানীগণের জন্য একমাত্র আশ্রয়স্থল। ইহাও আমার দাবী যে, অতীতে আগত সকল ধর্মের সকল নীতিমালাগুলি আমার মাধ্যমেই পূর্ণভাবে পুণ্যে পরিণত হয়েছে এবং এসব আমাতে মিশে সম্পূর্ণভাবে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আমি বিনে পৃথিবীর কোন ধর্ম বিধানই এখন আর স্বর্গ স্বীকৃত পুণ্য-সন্তান জন্মদানে সক্ষম নহে যা আমা কর্তৃক সম্ভব। এ ব্যাপারে যদি কারো বিন্দুবৎ সংশয় থাকে তবে সে আসুক সৎ সাহসে দোয়াযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তার সত্যাসত্য পরীক্ষা করে নিক। তৎপ্রেক্ষিতে সবার জন্য দ্বার উন্মুক্ত রইল। তবে এ ব্যাপারে আমার জ্বলন্ত দাবী এবং জীবন্ত প্রমাণ হলো বর্তমান দিনের যুগের মাহ্দী বলে দাবীদার পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামের হযরত মির্যা গোলাম মুর্তজা ও হযরত চেরাগ বিবির স্বনামধন্য পবিত্র পুত্র হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ), যিনি আমাকে চিনে এবং আমাতে মিশে প্রাপ্ত হয়েছেন আকাশের দেয়া শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'মিনান্নবীঈন' যাঁর গৌরবান্বিত কর্মকান্ডের ফলে গোটা বিশ্ব আজ শংকায় কম্পমান, যার ফলে তার পৃষ্ঠদেশের আর সব ধর্মগুলির অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার পথে। বিনিময়ে বিশ্বব্যাপী জনসমুদ্রে কম্পমান ধ্বনি উঠেছে কলেমার বজ্র নিনাদে। আমি সত্য সত্যই বলছি যে, পৃথিবীর যেজন আমার বর্তমানের নব কর্মসূচীর খবর নিতে মোটেই উৎসুক নহে সেজন বড়ই ভাগ্যহীন, সে নিশ্চিৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। খোদা তাকে ধ্বংস করতঃ ক্ষান্ত হবেন। ইহা আমার এবং আমার প্রতিনিধি মাহ্দী (আঃ)-এর সত্যতার একটি স্মরণীয় নিদর্শন। এবং আলোকজেন্ডার ডুই, পন্ডিত লেখরাম এর রাজ-সাক্ষী। আর তা এ জন্যই যে, আমার সাথে পরাক্রমশালী খোদার অঙ্গীকার অনুরূপই বটে। তিনি বলেছেন, **"ওয়া কাযালিকা নাজযি মান আসরাফা ওয়ালাম ইউমিম্ বি আয়াতি রব্বিহী, ওলাআযাবুল আখিরাতি আশাদ্দু ওয়া আবক্বা,** অর্থাৎ "এবং যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করে এবং তাহার প্রভু-প্রতিপালকের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে না আমরা তাহার সহিত এরূপই ব্যবহার করিয়া থাকি। (আর ইহা কেবল ইহকালের জীবনের ব্যবহার) এবং পরকালের আযাব ইহা অপেক্ষা আরও কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে" (২০ঃ১২৮)।

আমার ভাবতে কষ্ট হয় যে, আমার নবজীবন প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত ধর্মের সেবক সেজে তখনকার বক ধার্মিকগণ ধর্মের মৌলিকতা এবং এর সৌন্দর্যকে নানা কৌশলে কেবল যে বিকৃতই করেছে তা নয় তাকে দুর্গন্ধময় করে তুলেছে। ধর্মের রূপকে মানুষের মাঝে বিরূপভাবে উপস্থাপন করেছে। মানুষের চিত্তের খাদ্যের যোগানদানের পরিবর্তে স্বীয় উদর পূর্তির চেষ্টা করেছে। **কুন ফায়াকুন** শক্তিধর খোদার সাথে অংশীদার সৃষ্টি করেছে, যা আকাশের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত। অনুরূপ কারণেই মানুষ এখন ধর্মের প্রতি সর্বৈব বিরাগভাজন হয়ে এলোমেলোভাবে ছুটে চলেছে এবং আত্মার মুক্তির জন্য "ভক্ত বাবা" কিংবা "আৎকা পীরের" মাজার গাহে ফকীর সেজে ফিকির করে ফিরছে। মূলতঃ এসব ধর্ম-কর্মের প্রতি খোদা ভীষণভাবে রুষ্ট এবং কঠিনভাবে নারাজ। এতদিন তিনি তা নীরবে সহ্য করে গিয়েছেন কিন্তু এখন আর তিনি তা করবেন না। কাজেই তিনি পুনরায় আমাকে নবরূপে পৃথিবীতে উপস্থাপন করেছেন, আর আমাকে নবরূপে মানুষের মাঝে উপস্থাপন করার মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাঁর পূর্বেকার সেই ওয়াদাকে পৃথিবীর বুকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর ঘোষণা ছিল, অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীনরূপে মনোনীত করিলাম" (৫ঃ৪)। কিন্তু কালের আবর্তে আমার সেই পবিত্রতা, মান-সম্মান এবং সুনাম সৌন্দর্যের খ্যাতি ভীষণভাবে হ্রাস পেয়েছে, শ্রেষ্ঠত্বের স্বাতন্ত্র হারিয়েছে। আমার হাল যেন বেহাল হয়ে পড়েছে। আর এসবের মূলে কেবল বিজাতিরাই নহে বরং আমার স্বজাতির নিষ্ঠাহীন বিশ্বাস আমাকে আরও বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এখন অবশিষ্ট রয়েছে কেবল আমার অনুসারীদের পরস্পর পরস্পরকে ফতোয়া প্রদানের মাধ্যমে কাফির বানানোর প্রতিযোগিতা। সে কারণেই আমি আমার তথাকথিত ভক্তদের পরিত্যাগ করে বর্তমান দিনের আমার শ্রেষ্ঠ ভক্তপ্রাণ স্নেহের পবিত্র দুলাল পাঞ্জাবের মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে সাথে করে পুনরায় নবরূপে নব আয়োজনে ও নব প্রয়োজনে বিশ্ব মানবের মাঝে হাজির হয়েছে। আর পৃথিবীতে আমার পুনঃ আগমন হয়েছে বলেই যে আমি অন্যতম কেবল তা-ই কিন্তু নয়, বরং আমার কণ্ঠ-ফাটা স্লোগান ইহাও যে,

আমিই কেবল বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আমি কাহারও কোন দয়াদাক্ষিণ্যের মুখাপেক্ষী নহি। পরন্তু পৃথিবীর সকলেই আমার কুদরতের মুখাপেক্ষী। কেননা, মহিমায় আমি তুলনাহীন। যারা আমার এই মহিমা ভান্ডারে আবগাহন করতে ঈর্ষান্বিত হবে ইহা নিশ্চিত যে, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তাদের প্রার্থনা ঘৃণার সাথে তিরস্কৃত হবে। তাদের আত্মা লজ্জার সাথে ধিকৃত হবে। ইহা অকৃত্রিম সত্য যে, আমি মানুষের আত্মার জন্য সরোবররূপে ধরায় আগমন করেছি। আর অন্যেরা প্রত্যেকেই আসছে এই সরোবরের অংশ বিশেষ হিসেবে। আর বলতে কি তারও বৈশিষ্ট্যসমূহ কালের আবর্তে বিবর্ণ হয়ে পড়েছে, যা কাউকেই পূর্ণাদর্শের মানব তৈরীতে কোন ভাবেই সক্ষম নহে। কিন্তু খোদার কসম আমার সত্তা ও শক্তি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে বলছি যে, যেজন তার পার্থিবতার মোহকে পরিত্যাগ করতঃ নির্মল চিত্তে আমার আধ্যাত্মিক কল্যাণপূর্ণ সরোবরে ডুব দিবে সে কেবল পুণ্যবানই হবে না বরং নবী সদৃশ জীবন লাভ করতে সমর্থ হবে, যেমনটি হয়েছেন বর্তমান দিনের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। তাঁকে আমার কুদরতের দ্বিতীয় দফা প্রদর্শনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সেই বলে তিনি পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় পৃথিবীতে পরিণত করবেন। তার দ্বারাই আমার হারানো গৌরব ও সৌরভ ফের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। পৃথিবীতে কেবল তিনিই আমার একমাত্র প্রেমিক যিনি আমার অবমাননা রোধে অবলীলায় আপন জীবন উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত। কিন্তু এর জন্যে সকলের সমপরিমাণ সহযোগিতার প্রয়োজন। সুতরাং হে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইহুদী ধর্ম পুজারীগণ! তোমরা এস এবং শ্রবণ কর আমার সেই পবিত্র প্রতিনিধির দরদ-ভরা আহ্বান যা কিনা তোমাদেরকে মদ্যপানের নেশা থেকে মুক্তি দিয়ে খোদা প্রাপ্তির নেশায় উন্মাদ করে তুলবে। তোমাদেরকে স্বর্গ প্রদানের স্বীকৃতি দিতে সমর্থ হবে। আমি অনুরোধ করছি যে, তোমরা সকলেই তাঁর হয়ে যাও। তবেই খোদা তোমাদের হবেন। তোমাদের কর্মসমূহে বরকত দান করবেন। নচেৎ নয়। ইহাই মূল কথা যে, তাঁর স্বীকৃতি বিনে তোমরা কেউই আকাশের স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হবেনা। শ্রীকৃষ্ণ, ঈসা ও মূসা (আঃ)-এর অসমাপ্ত ধর্মাদর্শ এখন আর তোমাদেরকে স্বর্গদ্বারে পৌছাতে সমর্থ হবে না। কারণ আমার মাহ্দী (আঃ) বর্তমান যুগের প্রদীপ্ত সূর্য, সুতরাং সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ইতোপূর্বেকার পৃথিবীর সকল ধর্ম-প্রদীপগুলির আলোই এখন জ্যোতিহীন হয়ে পড়েছে। তাই তোমাদের বুদ্ধিমানের কাজ হবে ইহাই যে, তোমরা সেই সূর্যের দিকে ক্লান্তিহীনভাবে ধাবমান হও। তবেই তোমাদের চক্ষুগুলি আলোকপ্রাপ্ত হবে। নচেৎ তোমরা দৃষ্টিহীনের ন্যায় খোদা সকাশে হাজির হবে। স্মরণ রেখো যে, তোমাদের দ্বারা সাধিত পার্থিব উন্নয়নের কোন কর্মই তোমাদের আত্মার সম্মান সাধনে বিন্দুবৎ সহায়ক হবে না, বরং এসব তোমাদেরকে দিনে দিনে বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দিবে এবং ঠেলে দিচ্ছে। যার কারণে পৃথিবী এখন অশান্তির তাড়নায় আর্তনাদ করছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল আয়োজন সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত ও ব্যর্থ হচ্ছে। আর এরই সাথে আমার প্রবীণ অনুসারীদেরকেও এই মর্মে আহ্বান জানাচ্ছি যে, তোমরাও তোমাদের হৃদয়ের অহংকার বিদ্বেষগুলোকে প্রশমন করতঃ আমার মাহ্দী (আঃ)-এর নির্মীত গৃহে একীভূত হও। তাঁর দাবীর সত্যতা পরখ করতঃ স্বর্গ গমন পথ খুঁজে নাও। নচেৎ তোমরাও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। কারণ তোমরাও মহামহিম খোদার সিদ্ধান্তের সাথে জিদ করে বসে আছে। কিন্তু যেহেতু খোদা তাঁকে গ্রহণ করেছেন সেহেতু তিনি তাঁর মহা শক্তিশালী আক্রমণসমূহের দ্বারা আমার মাহদীর দাবীর সত্যতাকে ধরায় প্রতিষ্ঠিত করবেনই। পরিণামে তারাই কক্ষচ্যুত হয়ে মরবে যারা ছলনাময়ী পৃথিবীর দুষ্ট ভালবাসায় ধৃত হবে।

হে সত্যানুসন্ধিৎসু আত্মা সকল! আমি অতি দরদের সাথে বলছি যে, তোমরা যে কেউ যেকোন ধর্মের অনুসারীই হও না কেন, আমাকে শ্রবণ কর এবং আমার কথাগুলিকে স্মরণ রাখ। ইহা নিখাদ সত্য যে, যে পর্যন্ত না তোমরা আমার কল্যাণ দ্বারা সিক্ত হও তোমাদের জীবন কোনক্রমেই সফলতা লাভ করবে না। ইহা কেবল আমার মুখ নিঃসৃত বাণীই নয় বরং নিরীক্ষা করে দেখ তোমাদের ধর্ম বিধানগুলোতেও অনুরূপ অনুশাসন বিদ্যমান। যা বিশ্লেষণপূর্বক হেদায়াত লাভ করা উচিত। সুতরাং সব কথার শেষ কথা হলো এই যে, তোমরা আমাকে জান এবং গ্রহণ কর। আমার পবিত্র সত্তায় তোমরা নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে অস্তিত্বহীন হও। তবেই তিনি হবেন তোমাদের খোদা, যিনি আমারও খোদা। তিনি তোমাদেরও সেভাবে শ্রবণ করবেন আমাকে যেভাবে শ্রবণ করেন। একইভাবে তিনি তোমাদেরও যা বলবেন, ভালবাসবেন এবং সাহায্য করবেন, যেমনিভাবে তিনি আমাকে সাহায্য করেন ও ভালবাসেন। বিপরীত পক্ষে ইহাও সত্য যে, তোমাদের যারা আমাকে ও আমার মনোনীত জনকে মিথ্যাবাদী বলে জ্ঞান করবে, অবজ্ঞা ও অবহেলা করবে, তিরস্কার ও উপহাস করে উপেক্ষা করবে আর আত্মার প্রতি উদাসীন হয়ে উদর-যত্নে অধিক যত্নবান হবে তাদের পরিণাম হবে নিদারুণভাবে বেদনাময়। নজীর বিহীন শোকাতুর। তৎপ্রেক্ষিতে আমার সাথে খোদার অঙ্গীকার ইহাই বটে। তিনি বলেছেন, অর্থাৎ "সেদিন তোমাদের কতকজনের মুখমন্ডল হইবে অবনত, কর্মক্লান্ত- পরিশ্রান্ত। তাহারা প্রবেশ করিবে প্রজ্জ্বলিত আগুনে। তাহাদিগকে পানি পান করানো হইবে ফুটন্ত ঝরণা হইতে শুষ্ক তিক্ত কন্টকময় তৃণ ব্যতীত তাহাদের জন্য অন্য কোন খাদ্য থাকিবে না" (৮৮ঃ৩-৭)। মূলতঃ অস্বীকারকারীদের জন্য খোদার অনুরূপ ব্যবস্থাই চিরন্তন বিধান। বস্তুতপক্ষে ইহ জগতেই তার কিছুটা নমুনা প্রদর্শিত হতে চলছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও প্রকটরূপে সংঘঠিত হতে থাকবে। এর জন্য প্রয়োজনে আসমান ও জমিনের শৃংখলাবিধিকে উলট-পালট করে দেয়া হবে। ভূতল ও ভূভাগের অস্তিত্বগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হবে এবং তা শুধু এ জন্যই হবে যে, তোমরা আমার মাহ্দী (আঃ)-কে গ্রহণ করতে ও সালাম জানাতে কাল বিলম্ব করেছ। তাঁকে বরণ করে নিতে অবহেলা করেছ। তাই সেদিন তোমাদের আস্ফলন হবে কেবল ইহাই যে, "হায়। পৃথিবীতে আজ একি হইতে চলিল"।

– মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী

ছোটদের পাতা

নেসাবে ওয়াক্‌ফে নও

(১৪ থেকে ১৫ বছরের বালক-বালিকাদের জন্য পাঠ্য-সূচী)

পরিশিষ্ট

নযম

শানে ইসলাম

মূল

১। ইসলাম সে না ভাগো রাহে হুদা এহী হ্যা
আয় সোনেওয়ালো জাগো শামসুয্ যোহা এহী হ্যা ॥

২। মুঝ কো কসম খোদা কী জিস্ নে হামে বানায়া
আব আসমাঁ কে নীচে দীনে খুদা এহী হ্যা ॥

৩। দুনিয়া কি সব দুকানেঁ হ্যাঁ হামনে দেখি ভালিঁ
আখের হুয়া ইয়ে সাবেত দারুশ্‌শিফা এহী হ্যা॥

৪। সাব খুশ্‌ক হো গ্যায়ে হ্যাঁ জিতনে থে বাগ প্যাহ্‌লে
হার তরফ ম্যাঁয়নে দেখা বুস্তাঁ হারা এহী হ্যা॥

৫। দুনিয়া মেঁ ইসকা সানী কোই নেহী হ্যা শরবত
পি লো তুম ইস কো ইয়ারো আবে বাকা এহী হ্যা॥

৬। ইসলাম কি সাচ্চাই সাবেত হ্যা জেয়সে সুরাজ
পার দেখতে নেহীঁ হ্যাঁ দুশমন বালা এহী হ্যা॥

৭। সও সও নিশাঁ দেখা কার লাতা হ্যা উওহ্ বুলা কার
মুঝ কো জো উস নে ভেজা বাস মুদ্দা'আ এহী হ্যা॥

৮। কারতা হ্যা মু'জিযৌসে উওহ্ ইয়ার দী কো তাজাহ্
ইসলাম কে চমন কী বাদে সাবা এহী হ্যা॥

৯। ইয়ে সাব নিশাঁ হ্যাঁ জিন সে দী আব তলক হ্যা তাজাহ্
আয় গিরনেওয়ালো! দোড়ো দী কা আসা এহী হ্যা॥

১০। কিস কাম কা উওহ্ দীঁ হ্যা জিস মে নিশাঁ নেহী হ্যা
দী কি মেরে পেয়োরো! যাররিঁ কু'বা এহী হ্যা॥

*** *** ***

১১। উওহ্ পেশওয়া হামারা জিস্‌সে হ্যা নূর সারা,
নাম উস্‌কা হ্যা মুহাম্মাদ দিলবার মেরা এহী হ্যা॥

১২। সাব পাক হ্যাঁ পায়াম্বর এক দূছরে সে বেহ্‌তর,
লেইক্ আয্ খোদায়ে ব্যরতার খাইরুল ওরা এহী হ্যা ॥

১৩। প্যাহ্‌লোঁসে খুবতার হ্যা খুবি মেঁ এক ক্বামার হ্যা,
উস পার হার এক নযর হ্যা বদরুদ্দোজা এহী হ্যা॥

১৪। প্যাহ্‌লে তো রাহ্ মেঁ হারে পার উসনে হ্যা উতারে
ম্যা যাউঁ উসকে ওয়ারে বাস না খুদা এহী হ্যা॥

১৫। পরদে জো থে হটায়ে আন্দর কী রাহ্ দেখায়ে
দিল ইয়ার সে মিলায়ে উওহ্ আ-শ্‌না এহী হ্যা॥

১৬। উওহ্ ইয়ারে লা মাকানী উওহ্ দিলবারে নেহানী,
দেখা হ্যা হাম্‌নে উস্‌সে বাস্ রাহনুমা এহী হ্যা॥

১৭। উওহ্ আজ শাহে দী হ্যা উওহ্ তাজে মুরসালী হ্যা,
উওহ্ তায়্যেব ও আমীঁ হ্যা উস্‌কি সানা এহী হ্যা॥

বঙ্গানুবাদ

১। ইসলাম থেকে পালিও না সঠিক পথ এটাই
হে ঘুমন্তরা! জেগে ওঠো মধ্য গগনের সূর্য এটাই ॥

২। আমি খোদার কসম যাচ্ছি যিনি মোদেরকে সৃষ্টি করেছেন
এখন আকাশের নীচে খোদার ধর্ম এটাই ॥

৩। পৃথিবীর সব দোকানকেই মোরা ভালভাবে পরখ করে দেখেছি
পরিশেষে ইহাই প্রমাণিত হয়েছে- আরোগ্য নিকেতন এটাই ॥

৪। প্রথমে যেসব বাগান ছিলো তা সব শুকিয়ে গেছে
চারিদিকে আমি দেখেছি সবুজ বাগান মাত্র এটাই ॥

৫। বিশ্বে এর সমতুল্য কোন শবরত আর নেই
তোমরা একে পান করে নাও বন্ধুরা! সঞ্জীবনী-সুধা এটাই ॥

৬। ইসলামের সত্যতা সূর্যের ন্যায় প্রমাণিত
অথচ শত্রুরা যে দেখে না এটাই বড় সমস্যা॥

৭। শ' শ' নিদর্শন দেখিয়ে তিনি ডেকে নিয়ে আসেন
আমাকে যে তিনিই পাঠিয়েছেন– এটাই হলো (আল্লাহ্‌র) উদ্দেশ্য॥

৮। ঐ বন্ধু মু'জিযা দ্বারা ধর্মকে সজীব করেন
ইসলাম-বাগানের ভোরের মৃদুমন্দ বাতাস এটাই॥

৯। এসব নিদর্শন দ্বারা ধর্ম এমন সজীব রয়েছে
হে পথভ্রষ্ট! দৌড়ে এস ধর্মের রক্ষাদন্ড এটাই॥

১০। যে ধর্মে নিদর্শন নেই উহা কিসের জন্যে
হে আমার প্রিয়রা! ধর্মের জরী-পোষ এটাই ॥

*** *** ***

১১। তিনিই মোদের নেতা, যাঁর মধ্য থেকে সব জ্যোতিঃ
নাম তাঁর মুহাম্মদ (সঃ) হৃদয় বিমোহিত করেছেন তিনিই॥

১২। সব পবিত্র, একে অন্য থেকে উৎকৃষ্টতর
কিন্তু মহিমান্বিত খোদার সৃষ্টির সেরা যে তিনিই॥

১৩। পূর্বতনদের থেকে উৎকৃষ্টতর, সৌন্দর্যে এক চন্দ্র সম
তাঁর পরে সবারই দৃষ্টি, পূর্ণ চন্দ্র এটাই॥

১৪। প্রথমে তো আমরা হেরে যাচ্ছিলাম, পরে তিনিই মোদের পার করে দিয়েছেন॥
আমি তাঁর জন্যে মম প্রাণ উৎসর্গ করলাম, আসলে তিনিই মোদের কর্ণধার॥

১৫। পর্দা উন্মোচন ক'রে তিনিই মোদের অভ্যন্তরীণ রহস্যাবলী দেখালেন
প্রাণ মোর প্রাণ-প্রিয়ের সাথে মিলিয়ে দিলেন– ঐ সংযোগকারী তিনিই॥

১৬। স্থানের অতীত সে বন্ধু অদৃশ্য মনোমোহনকে মোরা
তাঁরই মাধ্যমে দেখেছি, তিনিই পথপ্রদর্শক॥

১৭। তিনি আজ ধর্মের বাদশাহ্ তিনি সব প্রেরিতগণের মুকুট
তিনি পবিত্র ও বিশ্বস্ত, তাঁর প্রশংসা ইহাই॥

১৮। উস্ নূর পার ফিদা হুঁ, উস্কা হী ম্যাঁ হুয়া হুঁ,
উওহ্ হ্যা, ম্যাঁ চীয কিয়া হুঁ? বাস, ফায়সালা এহী হ্যা।
১৯। উওহ্ দিলবারে ইগানা, ইলমৌ কা হ্যা খাযানা,
বাকী হ্যা সাব্ ফাসানা, সাচ বে-খাতা এহী হ্যা।
২০। দিল মেঁ এহী হ্যা, হরদম তেরা সাহীফা চুমুঁ,
কোরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ, কা'বা মেরা এহী হ্যা।

১৮। সেই জ্যোতিতে আমি বিলীন, আমি তাঁরই হয়েছি
তিনিই (সব) আমি কী? (অর্থাৎ কিছুই না) প্রকৃত মীমাংসা এটাই॥
১৯। সেই অনুপম বন্ধু সব জ্ঞানের ভান্ডার,
বাকী সব বাজে গপ্পো অভ্রান্ত কথা এটাই॥
২০। অন্তরে মম ইহাই যে, সদা তোমার কিতাব চুমি,
কুরআনের (চারিদিকে) প্রদক্ষিণ করি- কা'বা মোর এটাই॥ (চলবে)

['কাদিয়ান কে আরিয়া আওর হাম' (পৃষ্ঠা ৪৮, ১৯০৭ ইং সনে মুদ্রিত) থেকে উদ্ধৃত]

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

'রাখে খোদা মারে কে?'

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি। তাঁর ইচ্ছার উপরেই এর অবস্থিতি, ক্ষয়লয় সব কিছু নির্ভরশীল। তাঁর সেরা সৃষ্টি মানুষের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। আমাদের জন্ম মৃত্যুতে তাঁর ইচ্ছাকেই কার্যকর দেখা যায়।

ইদানিং আমার ব্যক্তি-জীবনে এমন কিছু ঘটেছে যা নতুন করে ওসব বিষয় গভীরভাবে স্মরণ করিয়ে দিলো। অন্যান্য দিনের মত ২৯ জুলাই (২০০১ সাল) বিকালে ফুটপাথ দিয়ে পুলিশ লাইনের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে যাই। হঠাৎ এক যুবক (বয়স অনুমান ৩৫ বছর হবে) লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে বল্লো, তুইতো 'কাদিয়ানী'। উত্তরে বল্লুম, আমার জন্ম ও বাড়ি বাংলাদেশে আমি কাদিয়ানী হবো কি করে? তখন ঐ যুবক মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে জঘন্য ভাষায় গালি গিয়ে আমার ডান হাত ধরে। আমি বলি, রসূল করীম (সঃ)-এর আচরণের সাথে আপনার এই আচরণের কোনই মিল নেই। মিল নেই কুরআন পাকের আদর্শের সাথে। তখন যুবকটি বল্লো, আজ তোকে শেষ করে দিবো এবং আমার মাকে তুলে জঘন্য অশ্লীল ভাষায় গালি দিতে শুরু করে। তখন দাড়ি শোভিত অন্য একজন যুবক উপস্থিত হন ও জিজ্ঞেস করতে থাকেন, কি হলো, কি হলো? এ সময় আমি হাত টান দিয়ে প্রথম যুবকের মুষ্টি হতে আমার হাত বের করে নেই ও বিপরীতমুখী হয়ে নর্মাল স্পিডে হাঁটতে শুরু করি। তখনই প্রথম যুবক আমার ঘারে ঘুষি মারে। হাঁটার কারণে তা তেমন জোরে লাগে নি। পরে দু'জনের কেউ আমাকে অনুসরণ করে নি। প্রথমে যুবক সহজই আমাকে মারতে বা মেরে ফেলতে পারতো। কিন্তু রাখে খোদা মারে কে? আমার এ বয়সে (৮৬ বছর চলছে) জোরে হাঁটাও খুবই কষ্টকর, দৌড়ে চলাতো প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া তখন দোয়াতে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে, আর কোন কিছুই চিন্তা-ভাবনায় আসে নি। আমার ধারণা দ্বিতীয় যুবকের কারণেই প্রথম যুবক আমার অনুসরণ করে নি। আরো কিছুটা অগ্রসর হলে পুলিশ লাইনের জনৈক কর্মচারী আমাকে বল্লেন, কয়েকদিন আপনার সাক্ষাৎ পাই নি, দেন কি বই আছে, দেন। তিনি প্রায়ই আমার কাছ থেকে 'আমাদের' বই নিয়ে থাকেন এবং অনেকে এসব পড়ছেন। যে মারাত্মক ঘটনার পর এখন এ ঘটনা ঘটলো তা আমাকে অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি তৃপ্তি দিলো।

উপসংহারে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি। এ ঘটনা আমার ভাগিনা ডাঃ আবুল কাশেম শুনে মত প্রকাশ করলো যে, আপনার আধ্যাত্মিক তরক্কি হবে। একথায় আমি বেশ আনন্দ বোধ করি। জামাতের ভাই-বোন সবার কাছে দোয়ার আবেদন রাখছি যেন পরম করুণাময় আল্লাহ্ আমাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি দান করেন। উপরোক্ত দুই যুবকের জন্যও দোয়া করছি ও দোয়া চাচ্ছি যেন আল্লাহ্ তাদেরকে প্রকৃত ইসলামের নিষ্ঠাবান সেবক করেন। বিশেষতঃ প্রথম যুবক যেন গভীর অনুতাপ দ্বারা হৃদয়ের সব কালিমা বিধৌত করে নেয়। আমার ধারণা দৃঢ়মূল হচ্ছে যে, এ যুবক হয়তো আমার দেয়া কোন বই পড়েই ক্ষেপে উঠেছে নতুবা আমাকে দেখা মাত্র কাদিয়ানী বল্লো, কি করে?

- **মোহাম্মদ মোস্তফা আলী**
প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর

ঢাকা জামাতের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১২ই আগস্ট রোজ শনিবার বেলা ২.৩০ মিনিটে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার মজলিসে আমেলার সদস্য ও হালকা প্রেসিডেন্টগণকে নিয়ে এক কর্মশালা দারুত তবলীগের তিন তলাস্থ হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালার সেক্রেটারী ও প্রেসিডেন্টগণ তাদের নিজ নিজ দপ্তর / হালকার বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা পেশ করেন। কর্মশালাতে জামাতের দৈনন্দিন জামাতি কর্ম পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে সদস্যদেরকে অবহিত করা হয়।

এ কর্মশালায় বিভিন্ন সেক্রেটারী ও হালকা প্রেসিডেন্ট সহ মোট ২৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

- **মাহবুবুর রহমান**
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা

আন্তর্জাতিক সালানা জলসা জার্মানী-২০০১
দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে জার্মানীর ম্যানহেইমে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আর্ন্তজাতিক সালানা জলসা-২০০১ অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। নিম্নে দ্বিতীয় দিনের (২৫/৮/২০০১ শনিবার) দ্বিতীয় অধিবেশনে হুযূর আকদস (আইঃ)-এর ভাষণের সার সংক্ষেপ প্রদত্ত হ'ল ঃ

* ২০০১ সাল পর্যন্ত জামাত বিশ্বের ১৭৬ টি দেশে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৮৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ৯৪টি। ১৯৮৪-২০০১ এই ১৭ বছরে বিশ্বের নতুন ৮২ টি দেশে আহমদীয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়। এবছর নতুন ৬টি দেশে আহমদীয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ ক্ষেত্রে ঘানা জামাত ভেনিজুয়েলায় ও জার্মানী জামাত সাইপ্রাস, মালটা, ও আজারবাইজানে আহমদীয়ত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করে।

এছাড়া বাহামাতে জামাত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সফলতা আসে।

দেশ ভিত্তিক জামাতের সফলতা অর্জনের বর্ণনাঃ

নাইজার ঃ নাইজারে আহমদীয়তের প্রচারে সফলতা লাভ করে বেনিন জামাত। নাইজারে গত বছর ৬০ হাজার বয়াত হয়েছিল। আর এ বছর ৯৪ লক্ষ লোক বয়াত করে। ৪৮০ টি নতুন স্থানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ৫২৪ টি নতুন মসজিদ ইমাম সহ জামাতের অধীন হয়। ৫ জন বাদশাহ্‌ও বয়াত করেন।

টোগো ঃ এ দেশেরও দায়িত্ব ছিল বেনিনের উপর। গত বছর এদেশের বয়াত ছিল ১২ লক্ষ। আর এ বছর বয়াত হয় ১৭ লক্ষ ৭১ হাজার। ১৫৭ টি মসজিদ ইমামসহ জামাতে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়।

কেনিয়া ঃ এ বছর ৭০ টি নতুন স্থানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ৫৬ টি নতুন স্থানে নেযাম চালু হয়। ১২ টি নতুন মসজিদ নির্মাণ হয়। ৫ টি মসজিদ হাতে আসে। ২১৫ টি তরবিয়তি ক্লাস হয়। এতে ১৪ হাজার ৫ শ দায়ী ইলাল্লাহ ও মোয়াল্লেম তা'লীম ও তরবিয়ত পায়।

গত বছর ১ লক্ষ ১০ হাজার লোক বয়াত করে। এ বছর ৩৭ লক্ষেরও অধিক লোক বয়াত করে।

জিবুতি ঃ এ দেশের দায়িত্ব কেনিয়ার উপর ছিল। গত বছর এদেশে ৫০ হাজার লোক বয়াত করে: এ বছর ১ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশি লোক বয়াত করে। ৫টি নতুন স্থানে আহমদীয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইরিত্রিয়া ঃ এদেশের দায়িত্ব কেনিয়ার উপর ছিল। গত বছর ৩৬ হাজার লোক বয়াত করে। এ বছর ৮ লক্ষেরও অধিক লোক বয়াত করে। ২ বছর পূর্বেও সেখানে জামাত ছিল না। বর্তমানে ৬০ টিরও অধিক স্থানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইথিওপিয়া ঃ এ দেশের দায়িত্ব কেনিয়ার উপর ছিল। হুযূর (আইঃ) বলেন এটি হযরত বিলাল (রাঃ)-এর দেশ। এ দেশ জয়ের বাসনা আমার ছিল। গত বছর ৩৬ হাজার লোক বয়াত করে। এ বছর ৫০ লক্ষ ৬৫ হাজার লোক বয়াত করে। এখানে প্রথম 'মসজিদে বেলাল' এ বছর নির্মিত হয়।

তানজানিয়া ঃ এ বছর ৩১ টি নতুন মসজিদ ও ১২ টি নির্মিত মসজিদ জামাতের অধীন হয়। গত বছর প্রায় ১৫ লক্ষ লোক বয়াত করে। এ বছর ৭৩ লক্ষেরও অধিক লোক বয়াত করে।

মালাবী ঃ এ দেশের দায়িত্ব ছিল তানজানিয়ার উপর। গত বছর ৩৭৬ জন বয়াত করে। এ বছর ১ লক্ষ ৮০ হাজার লোক বয়াত করে।

মুজাম্বিক ঃ এ দেশের দায়িত্ব ছিল তানজানিয়ার উপর। গত বছর বয়াত করে ২৩ হাজার ৩শ' জন। এ বছর টার্গেট ছিল ১ লক্ষ। বয়াত করে ১০ লক্ষ। দুইজন গোত্র প্রধান ও ৫ জন আলেম বয়াত করে।

কঙ্গো ঃ গত বছর ১ লক্ষ ১৪ হাজার বয়াত করে। এ বছর ৭৬ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি লোক বয়াত করে। এ মধ্যে ৭২ লক্ষ খৃষ্টান হতে ও বাকিগুলো মুসলমান হতে আহমদী হয়। এর ইকোইডোর প্রদেশে ১০ লক্ষ ও বাকদন্ড প্রদেশে ২ লক্ষ আহমদী হয়।

আইভরি কোষ্ট ঃ ৬৫৩ টি নতুন স্থানে আহমদীয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়। ৫২২ টি পূর্ব নির্মিত মসজিদ আসে। ৪৭ টি প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ৪৬৯ জন গোত্র প্রধান ও ৩০৬ জন ইমাম বয়াত করেন। এ বছর ২১ লক্ষেরও অধিক লোক বয়াত করে।

বুর্কিনা ফাঁসু ঃ এ বছর ২৬ জাতির মধ্যে ২০ লক্ষের ও অধিক লোক বয়াত করে।

ঘানাঃ এ বছর ১৭ টি নতুন মসজিদ সংযোজিত হয়। মোট ৭৬৩ টি মসজিদ যার মধ্যে ৬৫৯ টি জামাত নির্মাণ করে। ১০ টি তবলীগি কেন্দ্র রয়েছে। এ বছর ১৩ লক্ষ ৭৩ হাজারেরও বেশি লোক বয়াত করে।

নাইজেরিয়া ঃ গত বছর ১ লক্ষ ৭ হাজার লোক বয়াত করে। এ বছর ৩ লক্ষ লোক বয়াত করে। এ বছর ২০টি মসজিদ নির্মাণ করা হয় ও ৩৬ টি পূর্ব নির্মিত মসজিদ সংযোজন হয়। মোট মসজিদ সংখ্যা ৩৭২ টি।

জার্মানীর ম্যানহেইমে অনুষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আর্ন্তজাতিক সালানা জলসা - ২০০১ উপলক্ষে ঢাকা তারুদ তবলীগ মসজিদে বাংলাদেশের আহমদীগণ কর্তৃক আলমী বয়াতে অংশ গ্রহণের দৃশ্য

সেনিগাল ঃ ৪৫ টি স্থানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮ টি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়। ১৫৮০ ইমাম এ বছর বিভিন্ন তরবিয়তি ক্লাসে আসেন। এ বছর ২ লক্ষ ৬১ হাজার লোক বয়াত করে।

সিয়েরালিওয়ন ঃ ৪২ টি নতুন স্থানে আহমদীয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩২০ টি জামাত রয়েছে। ২ হাজার ২শ' ৭৩ টি মসজিদ রয়েছে।

লাইবেরীয়া ঃ ৬১ টি জামাত ও ৭৬ টি মসজিদ রয়েছে। এ বছর বয়াত হয় ১ হাজার।

আমেরিকা ঃ আমেরিকায় ৩৬ টি ও কানাডায় ১০ টি প্রচার কেন্দ্র রয়েছে। শিকাগোতে মসজিদ নির্মাণের কাজ চলছে।

জার্মানী ঃ জার্মানী ১০০টি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়। ১০ টি নতুন জায়গার মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

ইংল্যান্ড ঃ ব্রা'ড ফোর্ডে এক একর জমি মসজিদ নির্মাণের জন্য ক্রয় করা হয়।

আলবেনিয়া ঃ এবছর প্রথম মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়।

নিউজিল্যান্ড ঃ একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য জায়গা ক্রয় করা হয়।

ইন্দোনেশিয়া ঃ এবছর ২৯ টি নতুন জামাত ও ১০ টি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়। এ বছর ১০ হাজার বয়াত হয়।

বাংলাদেশ ঃ এবার বাংলাদেশে আমার প্রত্যাশার বেশি ফল লাভ হয়েছে। অনেক কুরবানী তাদেরকে দিতে হয়েছে। তাদেরকে মারধর করা হয়েছে, বাড়ি ঘর পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এ প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেও ৭ টি স্থানে নতুন মসজিদ নির্মিত হয়। এ বছর প্রায় ২০ হাজার লোক বয়াত করে।

ভারত ঃ ভারতে গত বছরের বয়াত ছিল ২ কোটি ৮ লক্ষ। এ বছর বয়াত করে ৪ কোটি ২৫ লক্ষ ৩৬ হাজারেরও বেশি।

আর্ন্তজাতিক বয়াত ঃ-

১৯৯৩ - ২,০৪,৩০৮ জন

১৯৯৪ - ৪,১৮,২০৬ জন

১৯৯৫ - ৮,৪৫,২৯৪ জন

১৯৯৬- ১৬,০৬,৭২১ জন

১৯৯৭ - ৩০,০৪,৫৮৪ জন

১৯৯৮ - ৫০,০৪,০০৬ জন

১৯৯৯ - ১,০৮,২০,২২৬ জন

২০০০ - ৪,১৩,০৮,৩৭৬ জন

২০০১ - ৮,১০,০৬,৭২১ জন

আর্ন্তজাতিক সালানা জলসা জার্মানী ২০০১ এর উপস্থিতি ঃ-

প্রথম দিকে উপস্থিতি ছিল ৩৮ হাজার ৬শ' জন। সমাপ্তি অধিবেশনে উপস্থিত ছিল ৪৮ হাজার ১শ' জন। এর মধ্যে পুরুষ ছিল ২৩ হাজার ৩শ' ৩০ জন। নারী ছিল ১৮ হাজার ৩শ' ৭০ জন। শিশু কিশোর ৬ হাজার ৬শ'। এতে ৭ হাজার মেহমান ও ৪ হাজার জেরে তবলীগ ছিলেন।

এম.টি.এ-এর অনুষ্ঠান থেকে সরাসরি সংকলন করেছেনঃ

মৌঃ মোঃ নুরুল আমীন
মোয়াল্লেম

সুন্দরবন মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমা সুসম্পন্ন

গত ২৭শে জুলাই সুন্দরবন মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ১৯তম স্থানীয় ইজতেমা বাদ জুমুআ শুরু হয়। এই ইজতেমায় স্থানীয় যয়ীমে আলা জনাব আবু কাওছার ও বিশেষ অতিথি সাদেক দুর্গারামপুরী কায়েদ তজনীদ মোঃ ফয়জুল্লাহ্, কায়েদে মাল, মোবাশ্বেরুর রহমান, প্রাক্তন আমীর চট্টগ্রাম, জনাব আব্দুস ছাত্তার, অডিটর, জনাব কওছার আলি মোল্লা, রিজিওন্যাল নাযেম খুলনা, জনাব জি, এম মতিউর রহমান, জেলা নাযেম সাতক্ষীরা উপস্থিত ছিলেন। কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা নব প্রতিযোগিতা বক্তৃতা, প্রতিযোগিতা, দ্বীনি মালুমাত পরীক্ষা ও খেলা ধূলায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এই ইজতেমায় ৫৫১ আনসার উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি মজলিসে আনসারুল্লাহ্ সুন্দরবন।

মজলিসে আনসারুল্লাহ্, খুলনা রিজিওনের তৃতীয় রিজিওনাল ইজতেমা সুসম্পন্ন

গত ২৮ শে জুলাই মজলিসে আনসারুল্লাহ্,খুলনা রিজিওনের রিজিওনাল ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ভোর ৪টা তাহাজ্জুদের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। সকাল ৬টা কুরআন তেলায়তের মাধ্যমে (তৃতীয়) রিজিওনাল ইজতেমা উদ্বোধন করা হয়। রিজিওনাল নাযেম জনাব কাওছার আলি মোল্লার সভাপতিত্বে ইজতেমা আরম্ভ হয়। বিশেষ অতিথি জনাব আবু কওছার যয়ীমেআলা সুন্দরবন ও জমাতের আমীর জনাব সাদেক দুর্গারাম পুরী, কায়েদে তজনীদ। জনাব ফয়জুল্লাহ্, কায়েদে মাল, জনাব আব্দুল সাত্তার অডিটর। জনাব প্রফেসার আব্দুল জব্বার ও কায়েদ তবলীগ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইজতেমার কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন জামাত যেমন খুলনা, সুন্দরবন ঘড়িলাল জামাত হতে প্রায় ৭২ জন আনসার এই ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করেন কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগীতা উর্দ্দ নবম প্রতিযোগিতা, দ্বীমা'লুমাত প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, পয়গাম রেশানী। কুইজ, নামায প্রতিযোগিতা ও খেলাধূলা। অংশগ্রহণকারী মধ্যে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরন করেন বিশেষ অতিথি সাদেক দুর্গারামপুরী সবার শেষে দোয়া পরিচালনা করেন কওছার আলি মোল্লা, রিজিওন্যাল নাযেম।

অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ২৮/০৭/২০০১ তারিখ তৃতীয় রিজিওন্যাল ইজতেমা বরকত ও মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

আব্দুল মজিদ সরদার
সভাপতি
খুলনা রিজিওনাল ইজতেমা কমিটি।

নতুনদের পাতা

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাহাবীদের কুরবানী

পবিত্র কুরআনে এ আয়াতের অর্থ হলো ঃ- অবশ্য মু'মিনগণের মধ্যে কতক পুরুষ এমন আছে যাহারা সেই অংগীকারকে পূর্ণ করিয়াছে যাহা তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে করিয়াছিল। এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা (শাহাদত বরণ করিয়া) নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা অপেক্ষা করিতেছে এবং তাহারা নিজেদের সংকল্পে তিল পরিমাণও পরিবর্তন করে নাই। (আল্ আহযাব ঃ ২৪)

এই আয়াতটি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর শীষ্যগণের স্থৈর্য, ধৈর্য, বিশ্বস্ততা ও একাগ্রতা এবং তাহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্বন্ধে এক স্মরণিকা বিশেষ। অন্য কোন নবীর অনুসারীরা বিশ্বস্ততা ও সৎকর্মশীলতার এত বড় প্রশংসাপত্র আল্লাহ্‌র কাছ হতে পান নি। হযরত মুহাম্মদে আরাবী (সঃ)-কে আল্লাহ্‌তাআলা সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়াত দানকারী সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক রূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি এমন এক জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন যারা তৎকালীন সময়ের নিকৃষ্ট জাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। তিনি এ অধঃপতিত জাতির এভাবে তরবিয়ত করলেন যে, তারা ধর্মীয় জগতের আকাশে নক্ষত্র রূপে খচিত হলেন। হুযূর (সঃ) বলেন ঃ **"আসহাবী কাননুযুমে বেআইয়্যেহিম ইকতাদায়তুম ইহতাদায়তুম।"** অর্থাৎ, আমার সাহাবারা নক্ষত্রস্বরূপ। তাঁদের মধ্যে যাকে অনুসরণ করবে হেদায়াত পাবে। সাহাবীগণ নিজেদের জীবনে আমূল পরিবর্তন করে ধর্মীয় জগতে চির জীবন লাভ করেন। প্রভু মুহাম্মদ (সঃ) যেমন নবীগণের মধ্যে স্বীয় কর্তব্য পালনের দিক দিয়ে অনন্য ও অদ্বিতীয়, তাঁর সাহাবীগণও তেমনি নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের দিক দিয়ে অতুলনীয়। তাই সাহাবীদের ত্যাগ আজ আমাদের জন্য অনুকরণীয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ- **সাদফ তাহুম কাওমান কারাওমিন মিল্লাতিন ফাজাআলতাহুম কাসাবিকাতিল ইকইয়ানি।** অর্থাৎ হে নবী (সঃ) তুমি তাদিগকে গোবরের চাইতে নিকৃষ্ট জাতি হিসেবে পেয়েছিলে কিন্তু তুমি তাদিগকে সোনার টুকরা বানিয়ে দিলে।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহে রাবে' (আইঃ) ৮ই জুন, ২০০১ ইং জুমুআর খুতবায়ে রহীমিয়তের বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কথা ব্যক্ত করে বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের সেই পবিত্র জামাত ছিল, যে জামাত তাঁদের নবী থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় নি বরং তাঁর খাতিরে প্রাণ উৎসর্গ করতেও তাঁরা দ্বিধা বোধ করেন নি। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, **"মিনহুম মান কাদা নাহবাহু ওয়ামিনহুম মাইয়ানতাজের"** অনেকেই তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। নিজেদের অঙ্গীকার অনুসারে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন আর অনেকেই এখন অপেক্ষা করছেন যে, আমরা যদি এ পথে (আল্লাহ্‌র পথে) মারা যেতাম! রসূল করীম (সঃ)-এর পবিত্র পদমর্যাদা কেমন ছিল তা বোঝা যায়, কিন্তু এখানে এটিও ভাবা উচিত সাহাবা কেরাম রেযওয়ানুল্লাহে আলায়হিম আঁ হযরত (সঃ)-এর পবিত্র জীবনের উজ্জ্বল প্রমাণ। কোন ব্যক্তি এ সমস্ত প্রমাণকে যদি নষ্ট হতে দেয় বা অস্বীকার করে তাহলে সে রসূলে করীম (সঃ)-এর নবুওয়তকে অস্বীকার করে বা নষ্ট করতে চায়। **সুতরাং সেই ব্যক্তি রসূলে করীম (সঃ)-এর সত্যিকারের মূল্যায়ন করতে পারে, যে সাহাবায়ে কেরামকে সম্মান করে বা মূল্যায়ন করে।** যারা সাহাবায়ে কেরামকে কদর করে না, তারা রসূলে করীম (সঃ)-কে কদর করতে পারে না। কেউ যদি বলে যে, আমি রসূলে করীম (সঃ)-কে তো ভালবাসি। হুযূর (আইঃ) বলছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে ভালবাসা থাকবে আর সাহাবাদের সাথে শত্রুতা এটি কখনো একত্রে হতেই পারে না। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে ভালবাসা রাখে, তাদের অবশ্যই তাঁর সাহাবাকে ভালবাসা বাঞ্ছনীয়। সাহাবা রেযওয়ানুল্লাহে আলায়হিম, আল্লাহ্‌তাআলাকে সন্তুষ্ট করতে চাইতেন, এ পথে যতই কঠোরতা যতই কষ্ট আসুক না কেন। আল্লাহ্‌তাআলার দরবারে তারা ঝুঁকে গিয়েছিলেন, আর সেই পরীক্ষার নীচে আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টির ধনভান্ডার রয়ে গিয়েছে। কুরআনে করীম তাদের প্রশংসায় ভরা। কুরআন খুলে দেখুন, সাহাবা রেযওয়ানুল্লাহে আলায়হিমের জীবন রসূলে করীম (সঃ)-এর সত্যতার একটি বাস্তব প্রমাণ।

সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম যে পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তাকে কুরআন এভাবে বর্ণনা করেছে **"মিনহুম কাদানাহবাহু, ওয়া মিনহুমমাইইয়ান তাজের"** তাদের অনেকেই শহীদ হয়েছেন আল্লাহ্‌র পথে, আর অনেকেই শাহাদতের অপেক্ষায় আছেন। সাহাবারা ইহজগতের দিকে ঝুঁকেন নি, দীর্ঘ জীবন চান নি বা ধন-সম্পদও চান নি। সাহাবীদের ত্যাগের কথা স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয় তাই কয়েকজন সাহাবীর ত্যাগের ঘটনা এখানে বর্ণনা করছি ঃ

১। হযরত বেলাল (রাঃ) যৌবনেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উমাইয়া বিন খালফ নামক এক রইসের কৃতদাস ছিলেন। এ ব্যক্তি হযরত বেলাল (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁকে (রাঃ) লোহার পোশাক পরিয়ে আরবের রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখত, প্রচন্ড খরতাপে তখন আরবের বালুকা রাশি উত্তপ্ত হ'ত তখন হযরত বেলাল (রাঃ)-কে এর উপর শুইয়ে তাঁর (রাঃ) বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রেখে দিত যাতে তিনি নড়া-চড়া না করতে পারেন। তাঁকে বলা হতো তুমি লাত ও উয্যা দেবতাদের গ্রহণ কর এবং মুহাম্মদ (সঃ)-কে ছেড়ে দাও। হযরত বেলাল (রাঃ) বেদনায় কাতর হয়েও 'আহাদ', 'আহাদ', (এক, এক) উচ্চারণ করতেন। উমাইয়া এ উত্তর শুনে রাগে পাগল হয়ে যেত এবং হযরত বেলালের (রাঃ) গলায় দড়ি বেধে দুষ্ট ছেলেদের হাতে দিয়ে দিত। তার তাঁকে (রাঃ) মক্কার অলিতে-গলিতে পাথরের উপর দিয়ে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যেত। এতে হযরত বেলাল রক্তে রঞ্জিত হয়ে যেতেন। তখনও তিনি (রাঃ) আহাদ, আহাদ উচ্চারণ করতেন।

(সুনানে ইবনে মাজা, আসাদুল গাবা, প্রথম খন্ড ২০৬ পৃষ্ঠা)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করে খানা কা'বাতে গিয়ে উচ্চস্বরে কুরআন পড়ছিলেন। ইহা দেখে কাফিররা তাঁর উপর প্রচন্ডভাবে আক্রমণ করে। তাদের প্রহারে তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়েন। এ অবস্থাতেই কাফিররা তাঁকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে শুইয়ে পাথর মারতে থাকে। তিনি ধৈর্য ধারণ করে হাসতে থাকেন। একজন জিজ্ঞেস করলো, তুমি হাসছো কেন? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি যখন বাজার হতে কোন পাত্র কিনে, তখন সে উহাকে ভালোভাবে বাজিয়ে দেখে শুনে ক্রয় করে। আমি এজন্যে হাসছি যে, আমার খোদা আমাকে চিনেছেন। এ সত্য কথা ও নির্ভীকতা দেখে তাৎক্ষণিকভাবে সতরজন ইসলাম গ্রহণ করে।

৩। মক্কার একজন কর্মকার হযরত খাব্‌বাব ইসলাম গ্রহণ করলে কাফির বা তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন করে। একদা হযরত উমর (রাঃ) তার পিঠ দেখলেন ও বললেন, আমি কখনও এমন পৃষ্ঠদেশ দেখি নি। কারণ হযরত খাব্‌বাবের চামড়া চতুস্পদ প্রাণীর ন্যায় শক্ত হয়ে গিয়েছিল। হযরত খাব্‌বাব বলেন, মুশরিকরা কয়লা জ্বালিয়ে আমাকে তার উপর শুইয়ে দিত এবং এক ব্যক্তি আমার বুকের উপর দাঁড়িয়ে যেত, যাতে আমি নড়া-চড়া না করতে পারি। আমার পিঠ হতে জলীয় পদার্থ নির্গত হয়ে ঐ আগুনকে নিভাত, তবুও আমি ধৈর্য হারা হই নি।

(তাবাকাতে ইবনে সা'আদ, তৃতীয় খন্ড, ১১৭ পৃঃ)

৪। উহুদের যুদ্ধে হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর চতুস্পার্শে সাহাবাগণ নগণ্য সংখ্যায় রয়ে গেলেন। হযরত তালহা একাই প্রিয় নবীর হিফাযতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং শত্রুর তীর প্রতিহত করতে লাগলেন। শত্রুর তীর নিজ হাতে প্রতিহত করেন এমন কি এক তীরে তাঁর (রাঃ) এক হাত আহত হলে তিনি অপর হাত বাড়িয়ে দেন। পরবর্তীতে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাত আহত হলে তুমি কি ব্যথা

অনুভব করো নি? হযরত তালহা বললেন, আমার হাত আহত হয়ে অবশ হয়ে পড়ে, তবুও আমি স্থান পরিবর্তন করি নি, কারণ আমার সামনে হযরত নবী করীম (সঃ)-এর জীবন সবচে' প্রিয় ছিল।

৫। চতুর্থ হিজরীতে হযরত নবী করীম (সঃ) বনু মুহাবেব ও বনু সা'লাবকে (দু'টি গোত্র) প্রতিহত করার লক্ষ্যে চারশ' সাহাবীদের নিয়ে যুদ্ধে বের হন। প্রত্যেকের নিকট একটি করে বাহন ছিল। এত দূরের সফরে সকলেই নগ্ন পায়ে ছিলেন। চলতে চলতে প্রত্যেকের পা ঝাঁঝরা হয়ে যায় এমনকি অনেকের পায়ের নখ পর্যন্ত উঠে যায়। ক্ষতের কারণে অনেক সাহাবী নিজেদের পা কাপড় দিয়ে বেঁধে নেন। ভীষণ কষ্ট সেখানে। ক্ষুধা, পিপাসা ও চলা ছিল দুষ্কর। সাহাবীগণ পিছপা হন নি। ধৈর্যের চরম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের (সঃ) নির্দেশ পালন করেছেন।

৬। হযরত সা'আদ বিন রাফী উহুদের ময়দানে গুরুতর আহত হয়ে ময়দানের এক কোণায় পড়ে ছিলেন। যুদ্ধ থামার পর নবী করীম (সঃ) হযরত উবাই বিন কা'আবকে তাঁর (রাঃ) অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করেন। বহু কষ্টে হযরত উবাই বিন কাআব তাঁর (রাঃ) নিকট পৌছালেন তখন তিনি মৃত্যু পথ যাত্রী। হযরত উবাই তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন পয়গাম থাকলে দিন। মৃত্যু যন্ত্রণায় অজ্ঞান প্রায় হযরত সা'আদ (রাঃ) বললেন, হে আমার ভাই! মুসলমানদেরকে আমার সালাম দিও। আর আমার গোত্রকে বলো, তোমাদের জীবিত অবস্থায় যদি আঁ হযরত (সঃ)-এর কোন ক্ষতি হয় তবে মনে রেখ খোদার দরবারে তোমাদের কোন উত্তর গৃহীত হবে না। এ বলেই তিনি শহীদ হন। কতই না আশ্চর্য-জনক ঘটনা। মৃত্যুর সময় না স্ত্রীর চিন্তা না সন্তানের আর না-ই অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের। চিন্তা তো শুধু আল্লাহ্র রসূল (সঃ)-এর। তাঁর (সঃ) ভালোবাসার সামনে সব কিছুই হীন।

৭। হুদায়বিয়া সন্ধির সময় মুশরিক বা সাহাবীদের আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের জন্য প্রেম ও ভালবাসা এবং জীবন উৎসর্গ করে দেবার স্পৃহা দেখে হতবাক হয়ে যেতে হয়। তারা ফিরে এসে সঙ্গীদের বলে, "হে আমাদের সঙ্গীরা ! আমি বহু দরবারে গিয়েছি। কায়সার, কিসরা ও নাজ্জাশীর দরবারে গিয়েছি। কিন্তু দেবতাদের কসম মুহাম্মদ (সঃ)-এর মধ্যে তাঁর জন্য যে ভালোবাসা দেখেছি তা অন্য কোথাও দেখি নি। তাঁদের অবস্থা তো এমন পানি পান করতে গিয়ে মুহাম্মদ (সঃ)-এর মুখ হতে কয়েক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়লে তাঁর (সঃ) সঙ্গীগণ আবেগে সেই পানি নিজের হাতে নিয়ে নেয় এবং বরকত মনে করে নিজের চেহারায় ও দেহে তা মেখে নেয়।

(বুখারী, কিতাবুশ্ শুরুত)

৮। যখন তার বাবা হযরত আব্দুল্লাহ্ শাহাদত বরণ করেন এক যুদ্ধে তখন হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বড় দুঃখিত ছিলেন। মনমরা হয়ে বসেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তার কাছে আসলেন এবং বললেন, হে জাবের জান তোমার বাবা কে? কোন পর্দা বা আবরণ ছাড়া আল্লাহ্তাআলা তাকে দেখা দিয়েছেন। আল্লাহ্তাআলা কখনো আবরণ ছাড়া দেখা দেন না, কিন্তু তোমার বাবার আত্মা যখন আল্লাহ্র কাছে পৌঁছায়, তখন তোমার বাবার সামনে আল্লাহ্তাআলা আবরণ ছাড়া দেখা দিয়েছেন। এবং বলেছেন হে আমার প্রিয়! বল কী চাও? যা চাও তা-ই দিব। তোমার বাবা উত্তরে বলেছেন, যদি হে আল্লাহ্! তোমার এ কথাই হয়, তাহলে আমার চাওয়ার জিনিষ একটাই আছে, আমাকে আর একবার পৃথিবীতে পাঠাও! আমি পৃথিবীতে গিয়ে আবার তোমার রাস্তায় মরি, আবার ফেরত আসি, আবার ফেরত যাই পৃথিবীতে, আবার তোমার রাস্তায় মরি, আবার ফেরত আসি। আবার মরি, আবার ফেরত যাই পৃথিবীতে, আবার মরি তোমার রাস্তায় আবার ফেরত আসি। এত আনন্দ এই মৃত্যুতে, এত জীবন এই মৃত্যুতে যে, মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

৯। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমার চাচা আনাস ইবনে নদর বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নি। তিনি আরয করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি মুশরিকদের সাথে যে প্রথম যুদ্ধ করেছেন তাতে আমি শরীক হতে পারি নি। আগামীতে মুশারিকদের সাথে যে সব যুদ্ধ হবে, তাতে যদি আমি শরীক থাকি তাহলে আল্লাহ্ দেখে নেবেন আমি কি করি। কাজেই যখন ওহুদের যুদ্ধ হলো এবং মুসলমানরা বাহ্যতঃ পরাজয় বরণ করলো, তখন তিনি বলতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ্! এরা (অর্থাৎ সাহাবারা) যা কিছু করেছে তা থেকে নিজেকে দায়িত্ব মুক্ত ঘোষণা করছি। একথা বলে তিনি এগিয়ে গেলেন। সামনে থেকে সা'আদ ইবনে মু'আয এসে গেলেন। তখন বলতে লাগলেন ঃ হে সা'আদ ইবনে মু'আয! নদরের রবের কসম, ওহুদ পাহাড়ের কাছ থেকে জান্নাতের খুশ্বু পাচ্ছি। সা'আদ ইবনে মু'আয বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রসূল! তিনি যা করেছেন আমি নিজে তা করতে পারি নি। আনাস বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা তাঁর (আনাস ইবনে নদর) শরীরে আশিরও বেশী তলোয়ার, বর্শা ও তীরের আঘাত পেলাম এবং আমরা তাঁকে এমন অবস্থায় পেলাম যখন তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছেন এবং মুশরিকরা তার চেহারা বিকৃত করে দিয়েছিল। তাঁর বোন ছাড়া আর কেউ তাকে চিনতে পারলেন না এবং তিনিও তাঁকে চিনলেন তাঁর আঙ্গুলের ডগাগুলো দেখে (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম)।

১০। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় ওহুদের যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবী শাহাদত বরণ করেন এবং এ ঘটনা শুনে লোকেরা বিচলিত হয় নি বিচলিত হয়েছে তখন, যখন রটনা রটিয়েছে যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেক) শাহাদত বরণ করেছেন। তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন এবং লাশের উপর পড়ে গিয়েছিলেন, তার উপরে লাশ পড়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) -এর মাথার মধ্যে লৌহ শিরস্ত্রাণের কড়া ঢুকে গিয়েছিল। এ কথা শুনে মদীনার লোকেরা ছুটেছে ওহুদের প্রান্তরে। তাদের মধ্যে এক বুড়ি "মা" ছিলেন। যিনি দৌড়াতেও পারছিলেন না ঠিকমত। পথিমধ্যে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কোথায় যাচ্ছো? সে বলেছে, আমি দেখতে যাচ্ছি, রসূলুল্লাহ্ ঠিক আছেন না নেই। তাকে বলা হয় তোমার ছেলে মারা গেছে, সে বললো, আমি জিজ্ঞেস করছি রসূলুল্লাহ্ ঠিক আছেন কিনা। বলা হয়, তোমার স্বামী মারা গেছে। বলছেন, আমি স্বামীর খবর জানতে চাই নি, আমি বলেছি, রসূলুল্লাহ্ ঠিক আছেন না নেই। তোমার ওমুক আত্মীয় মারা গেছেন, তিনি বলছেন, আমি আমার ওমুক আত্মীয়ের কথা জিজ্ঞেস করছি না আমি জিজ্ঞেস করেছি, রসূলুল্লাহ্ ঠিক আছেন না নেই। তখন তাঁকে বলা হলো রসূলুল্লাহ্ আল্হামদুলিল্লাহ্ ঠিক আছেন। আহত হয়েছেন কিন্তু কোন অসুবিধা নেই ঠিক আছেন। আল্হামদুল্লিাহ্ বেঁচে আছেন এবং তিনি পথ-নির্দেশনা দিচ্ছেন আমাদেরকে। তখন সেই মহিলা বলেন, যত লোক ইচ্ছা মরুক, যখন রসূলুল্লাহ্ ঠিক আছেন, আমাদের কোন চিন্তা নেই।

১১। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনজন পাশাপাশি আহত অবস্থায় ছিলেন, পানি, পানি করছিলেন। এক মুসলমান পানি দিতে গেলে একজন বল্লেন না, আমার চেয়ে আমার পাশের জনের দরকার বেশী। তাকে পানি দিতে যাওয়া হলো, তিনি বললেন, না আমার চেয়ে বেশী আমার ডান পাশে যিনি শুয়ে আছেন, তাঁকে দাও, (মানে একদম পাশাপাশি না, দূরে, দূরে ছিলেন) যখন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গেলেন, তৃতীয় ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে ফেলেছেন। ফেরত আশা হলো দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে। তিনিও মৃত্যু বরণ করেছেন। প্রথম ব্যক্তির কাছে গেলেন তিনিও মৃত্যুবরণ করেছেন।

সাহাবাদের জীবন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রেমে বিভোর ছিল। যে রসূলের (সঃ) জন্য তারা নিজেদের জীবন ও রক্ত পানির ন্যায় বইয়ে দিয়েছেন সে রসূল সম্বন্ধে কাফিররা ঘোষণা দিয়েছে **"আশেকা মুহাম্মাদুন রব্বাহু"** অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ) তো তাঁর প্রভুর প্রেমে বিদগ্ধ।

আমরাও যদি নিজেদের সব কিছু আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের জন্য উৎসর্গ করতে পারি তবেই আমাদের জীবন সার্থক। আল্লাহ্তাআলা সকল সাহাবীর প্রতি আশীষ বর্ষণ করুন এবং আমাদেরকে তাঁদের পদ চিহ্নে চলার তৌফীক দিন, আমীন।

-শেখ আব্দুল ওয়াদুদ
মোয়াল্লেম

নতুনদের পাতা

ইসলামী সাম্যবাদ

তথাকথিত আধুনিক সাম্যবাদীরা ইসলামের মহান আদর্শ 'সাম্যবাদ' সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা গোঁড়ামীর কারণে ভুল এবং বিভ্রান্তিমূলক ধারণা পোষণ করে থাকেন। তাদের ধারণা ইসলামী সাম্যবাদে মানুষের মেধা এবং শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি বা মূল্যায়ন সঠিকভাবে নিরূপিত হয় না। কেউ কেউ মনে করেন ইসলাম সাম্যের বদলে মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে। তাদের কারো ধারণা ইসলাম-পূর্ব জাতি-সত্তার চেয়ে ইসলাম তেমন কোন সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয় নি। অবশ্য এর বাইরেও অনেক বড় বড় পন্ডিত রয়েছেন যারা ইসলামী সাম্যবাদ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং ইসলামী সাম্যবাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ রচনায় সঙ্গত কারণে এর ব্যাপক আলোচনায় যাচ্ছি না, তবে ইসলামী সাম্যবাদ কী এবং কেন এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ্। প্রকৃতপক্ষে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার লাভ বা অধিকার প্রতিষ্ঠার সমউপায় এবং সুযোগ ইসলামই এ পৃথিবীতে পরিপূর্ণভাবে দান করেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, 'ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সব মানুষই সমান।' ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কোন প্রকার বর্ণ বা শ্রেণী প্রথাকে সমর্থন করে না। ইসলামে সবার জন্য পূর্ণ সমতার বিধান প্রতিষ্ঠিত। কোন বিশেষ ব্যক্তি দল বা গোষ্ঠিকে অন্য কোন ব্যক্তি দল বা গোষ্ঠির তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের সনদ ইসলাম প্রদান করে না। আরব-অনারবের প্রাগ্ ঐতিহাসিক বিভেদের রেখা ইসলাম নির্মূল করেছে, নিন্দা করেছে বংশ মর্যাদার অমানবিক দ্বন্দ্বের। যদি কোন ব্যক্তি সৎ প্রচেষ্টার দ্বারা পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে উৎকর্ষ লাভ করে তবে ইসলাম তার প্রচেষ্টা-লব্ধ উন্নতির স্বীকৃতি প্রদানে মোটেই কার্পণ্য করে না। অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতির বিষয়ে ইসলাম সব মানুষকে একই পর্যায়ভুক্ত জ্ঞান করে। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নয়নে সৎপরিশ্রমের পূর্ণ মূল্যায়ন করে এবং এরূপ উন্নতিকে আরো উৎসাহিত করে। মানুষের মেধা শক্তি এবং সামর্থ্যকে সৎ এবং সঠিকভাবে প্রবাহিত করে ব্যক্তি এবং সামষ্টিক জীবনে সমতা প্রতিষ্ঠাই ইসলামী সমাজের লক্ষ্য।

ইসলামের মহান সাম্য দর্শন সম্যকভাবে জ্ঞাত না হয়ে যারা ইসলামকে তুচ্ছ এবং হেয় করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাদের সমীপে কুরআন এবং হাদীসের কয়েকটি নীতি নির্ধারণী প্রস্তাবনা পেশ করলেই আশা করি ইসলামী সাম্যবাদ সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসন এ কার্যকর হবে। ইসলামী সাম্য দর্শন সম্পর্কে আল্লাহ্তাআলা ঘোষণা করছেন ঃ "হে লোক সকল, তোমাদের প্রভু আল্লাহ্কে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি আত্মা থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং তাথেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাদের থেকে অনেক নর-নারী সৃষ্টি করে বিস্তৃত করেছেন।" উক্ত আয়াতে ইসলামী সাম্যবাদের শাশ্বত শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। মানুষের সৃষ্টির একই উৎসকে স্মরণ করানো হয়েছে। মানুষকে বুঝানো হয়েছে সৃষ্টির শুরুতে তারা একই পিতা-মাতার সন্তান। অতএব মনুষ্য সৃষ্ট তথাকথিত বিভেদ ও বৈষম্যের মূলে ইসলাম সজোরে কুঠারাঘাত করে সাম্যের বাণী বিধৃত করে। বিবর্তনের ধারায় মানুষের সামাজিক মর্যাদায় যতোই পার্থক্য ঘটুকনা কেন মানুষ যে একই পিতার সন্তান তা যেন পরস্পরের বর্তমান আচরণের মাধ্যমে বিস্মৃত না হয়। এই আয়াতে ইসলাম এ শিক্ষা দিয়েছে যে, একই পিতার কোন সন্তান যদি তার অপর ভাইকে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তুচ্ছ এবং হেয় জ্ঞান করে তা মোটেই শোভনীয় নয়, আর তাতেই কি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে চির অবসান সম্ভব? একই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন মজীদে আরো বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই সমস্ত বিশ্বাসী ভাই ভাই, সুতরাং ভাইদের মাঝে শান্তি স্থাপন কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরকে অবজ্ঞা করো না, কারণ যাকে অবজ্ঞা করা হয় সে তোমাদের চেয়েও উত্তম হতে পারে। স্ত্রী লোকগণও যেন একে অপরকে অবজ্ঞা না করে কারণ যে স্ত্রী লোককে অবজ্ঞা করা হয় সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমাদের নিজস্ব লোকদের অপবাদ দিও না। এবং পরস্পর পরস্পরকে অবজ্ঞাসূচক নামে সম্বোধন কর না। ঈমান আনার পর দুষণীয় নাম ((দিয়ে ডাকা) বড়ই মন্দ কথা; এবং যারা ঈমান আনার পর তওবা করবে না তারাই যালেম। হে মানবমন্ডলী! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার, নিশ্চয় আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বাধিক সম্মানীত যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ সর্ববিদিত" (সূরা হুজুরাত; ১১, ১২ ও ১৪ নং আয়াত)।

এ বিষয়ে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ্তাআলা তোমাদের মধ্য থেকে জাতি-গৌরব তুলে নিয়েছেন, কারণ কোন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। আবার কোন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ঈমানও আনে না, সৎকর্মও করে না। সব মানুষই আদমের সন্তান এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।" তিনি (সঃ) আরো বলেছেন ঃ "মানুষ একই খনিতে রক্ষিত বিভিন্ন বর্ণ এবং ধর্ম সম্বলিত সম্পদ বিশেষ। জাতিভেদ, শক্তি এবং সম্পদ যা ইসলামের পূর্বে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক স্বরূপ বিবেচিত হত, তা ইসলাম আবির্ভাবের পরেও শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে যদি এসব গুণের অধিকারীগণ সততা রক্ষা করে চলে এবং ধর্মকে পার্থিব বিষয়াদির উপর অধিকতর প্রিয় বলে জ্ঞান করে।" অর্থাৎ ইসলাম মহত্বের এবং শ্রেষ্ঠত্বের সুপ্রসিদ্ধ নিদর্শনগুলো বিলোপ করে নি বরং ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে এবং পার্থক্যস্বরূপ সুনির্দিষ্টভাবে খোদা-ভীতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। নবী করীম (সঃ) আরো বলেছেন ঃ "হে মুসলমানগণ! তোমাদের আচরণ দ্বারা মানুষের সামাজিক অবস্থা ও পদ মর্যাদার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করবে।" তবে বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষ যেন ভুলবশতঃ উক্ত হাদীসের অপপ্রয়োগ না করে যে জন্য তিনি (সঃ) নির্দেশনা দিয়েছেন ঃ "তোমাদের পূর্ববর্তী কোন কোন জাতি এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তারা (কোন অন্যায়ের জন্য) কাউকে দরিদ্র বলে শাস্তি দিয়েছে, অথচ কেউ ধনী বিধায় তাকে অব্যাহতি দিয়েছে। খোদার শপথ যদি আমার কন্যা ফাতিমাও চুরি করতো আমি তারও হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।" আল্লাহ্র রসূলের এ নির্দেশনার আলোকে আইন অনুযায়ী প্রত্যেক দুষ্কৃতকারীই সমান শাস্তিযোগ্য। ধনী বা দারিদ্রতার সীমা-রেখায় বিচার ব্যবস্থায় কোন ভেদাভেদ গ্রহণীয় নয়।

দ্বায়িত্বভার অর্পণের ক্ষেত্রেও ইসলামে রয়েছে সুনির্দিষ্ট রূপ-রেখা, যা এক্ষেত্রে সাম্যবাদের মহান আদর্শকে উজ্জ্বলতা দান করেছে। পবিত্র কুরআন মজীদে এ বিষয়ে আল্লাহ্তাআলা ঘোষণা করেছেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার প্রাপককে অর্পণ কর এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে বিচার কর তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন নিশ্চয় তা অতি উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি তা হলো ঃ (১) সব মানুষ একই আদি পিতার সন্তান এবং এ সূত্রে সবাই পরস্পর ভাই ভাই। তারা একে অন্যের কাছে গর্ববোধ করবে না এবং সমজাতীয় লোককে কখনো অবজ্ঞা করবে না। তারা একে অপরের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হয়ে পরস্পর সহোযোগিতা করবে এবং শান্তি স্থাপনকারী হবে।

(২) আল্লাহ্‌র কাছে তিনিই মহান যিনি চরিত্রবান ও ধার্মিক। এজন্য নিম্নপদস্থ ব্যক্তিও যদি উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর ধার্মিক ও চরিত্রবান হন তবে তিনিই প্রকৃত মহান ব্যক্তি বলে গণ্য হবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি সততা এবং নিষ্ঠাগুণে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হন তবে তাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

(৪) আইনের চোখে সবাই সমান এবং সবাইকে সমভাবে বিচার করতে হবে।

(৫) উন্নতির দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত। ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও চরিত্রের বলে প্রত্যেক ব্যক্তিই উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে সমাসীন হতে পারেন। তার উন্নতির পথে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

ইসলাম সাম্যবাদের এই পঞ্চনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামের পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর খলীফাগণ এ মহান নীতির অনুসরণ করেছেন। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কোন ভেদাভেদ নেই, সবাই ভাই বলে গণ্য। 'ইসলামে সর্বোচ্চ বিচারালয় আল্লাহ্‌র আদালত এবং মসজিদ-এর প্রতীকস্বরূপ।' মসজিদে কারও জন্য কোন নির্দিষ্ট সংরক্ষিত স্থান নেই। যিনি যেখানে ইচ্ছা বসতে পারেন এবং যিনি আগে আসবেন তিনিই আগে বসবেন। যিনি পরে আসবেন তিনি অপরকে সরিয়ে বসার অধিকার রাখেন না। যদি ভৃত্য প্রভুর আগে আসেন তবে প্রভুকে শেষের সারিতে বসতে হবে। সংক্ষেপে এ কথা বলা যায় যে, ইসলামে উঁচু-নীচু, ভৃত্য, সবল-দুর্বল নির্বিশেষে সবাই সমান। তাদের মধ্যে কোন মৌলিক ভেদাভেদ নেই। হযরত রসূলে করীম (সঃ) এবং তার খলীফাদের যুগে সব মানুষই ভাই ভাইয়ের মত মজলিসে আসন গ্রহণ করতেন। কখনো এমন হতো যে, নবাগতরা নবী করীম (সঃ)-কে সনাক্ত করতে ভুল করতো।

ইসলাম কখনো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানার্থে দরিদ্রদের অধিকার হরণে বিশ্বাস করে না। ইসলামে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ ধন-দৌলত দ্বারা হয় না বরং খোদা-ভীতির মানদন্ডে নিরূপিত হয়। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে একদল নওমুসলিম যুবক তাঁর দরবারে এসেছিলেন। একই সময়ে কয়েকজন দরিদ্র সাহাবাও তাঁর দরবারে আসলেন, হযরত ওমর (রাঃ) নও মুসলিম যুবকদের পিছনের সারিতে বসতে বললেন এবং দরিদ্র সাহাবা (রাঃ)-দের তার কাছে বসালেন। এ মহান শিক্ষা ইসলামের পবিত্র নবীর (সঃ) কাছ থেকেই তাঁর সাহাবাগণ লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্মানীত হওয়ার জন্য কেবলমাত্র ধন-দৌলত বা উচ্চ বংশই মাপকাঠি নয়। তবে একথাও ঠিক যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজের সম্মানীত এবং উচ্চপদস্থদের জন্যও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের নীতিমালা বিদ্যমান। একবার মক্কার আউস গোত্রের সর্দার সা'দ বিন মোয়ায বনু কোরাইযা সম্পর্কে তার বক্তব্য পেশ করার জন্য নবী করীম (সঃ)-এর সমীপে আসলেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সা'দ বিন মোয়াযকে সম্মান দেখানোর জন্য নিজেও দাঁড়ালেন এবং মজলিসে উপবিষ্ট সাহাবাদেরকেও দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদেশ করলেন। পবিত্র কুরআন মজীদেও হযরত মূসা (আঃ)-এর ফেরাউনের দরবারে প্রবেশকালে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ইসলাম সর্বত্র বিনা কারণে এ ধরনের ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। বরং এই আংশিক এবং সীমাবদ্ধ বৈচিত্র কেবল মাত্র সামাজিক এবং শাসনতান্ত্রিক বিষয়েই পালনীয়। অন্যথায় বিচার কার্যে ইসলামের সব শ্রেণীর মানুষই সম সুযোগ এবং অধিকার লাভ করে থাকে। সবলের বিপক্ষে দুর্বলের, ধনীর বিপক্ষে দরিদ্রের ন্যায় বিচার লাভের অসংখ্য উদাহরণ ইসলামের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ইসলামের খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) খেলাফতে আসীন হওয়ার পরে তার প্রথম খুতবায় বলেছিলেন ঃ "তোমাদের মাঝে যিনি দুর্বল তিনিই আমার কাছে সবল, যে পর্যন্ত না আমি তার প্রাপ্য আদায় করি; আবার সবল ব্যক্তিই আমার কাছে দুর্বল যে পর্যন্ত না আমি তার দেয় তার থেকে গ্রহণ করি"। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তার খেলাফত কালে এ নীতি থেকে এক চুলও বিচ্যুত হন নি।

তদ্রূপ দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমরের (রাঃ) খেলাফতকালে জুবালা বিন আইহাম নামে উত্তর আরবের একজন গোত্র প্রধান একবার মদীনা পরিদর্শন করতে আসেন। তখন মদীনার একজন দরিদ্র মুসলমানের সাথে তার কথা কাটা-কাটি হয় এবং জুবালা দরিদ্র মুসলমানের গালে সজোড়ে চড় মারেন। এ ঘটনা হযরত ওমরের (রাঃ) গোচরীভূত হলে খলীফা জুবালাকে দৃঢ়তার সাথে জানিয়ে দেন, যদি এ ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয় তবে জুবালাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। শাস্তির জন্য জুবালা রাতের আঁধারে মদীনা থেকে পালিয়ে যায় এবং ইসলাম পরিত্যাগ করে। জুবালা গোত্র প্রধান হওয়ার কারণে খলীফা তাকে মোটেও পরওয়া করেন নি এবং তার ইসলাম পরিত্যাগেও খলীফা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি।

ইসলামী সাম্যবাদের গৌরবময় দর্শন হলো ইসলাম সব মানুষের দক্ষতা, সততা, মেধা ও বিচক্ষণতাকে সমভাবে মূল্যায়ন করে তা যে কারো হোক। ইসলামের প্রথম যুগে যখন মুসলমানরা তাদের পূর্বের গর্ব এবং আমিত্বের দাসত্ব থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি সেই যুগে নবী করীম (সঃ) একদল চৌকস সেনাবাহিনীর পুরোভাগে হযরত ওসামাকে নিযুক্ত করে এক জরুরী যুদ্ধাভিযানে পাঠান। মদীনার সর্বত্র কানাঘুষা শুরু হলো যে, একজন দাসের পুত্র আরব সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছেন। যখন এহেন কথা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কানে পৌঁছাল তখন তাঁর (সঃ) মুখমন্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে গেল। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে বললেন ঃ "তোমরা কি ওসামাকে সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ায় আপত্তি করছ? এর পূর্বেও তোমরা ওসামার পিতাকে সেনাপতি নিযুক্ত করায় আপত্তি করেছিলে। খোদার কসম! ওসামার পিতা যেমন সেনাপতি হওয়ার যোগ্য ছিলো ওসামাও তদ্রূপ সেনাপতি হওয়ার যোগ্য এবং ওসামার পিতা যেমন আমার কাছে প্রিয় ছিলো তদ্রূপ ওসামাও আমার কাছে প্রিয়"।

ইসলামী সাম্যবাদের সুমহান গৌরবময় দর্শন এমনই যে, যোগ্যতার ফলে নিম্নতম ব্যক্তিও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। দারিদ্র্য বা বংশ মর্যাদা তার উন্নতির পথে মোটেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। ধনী-গরীবের ভেদা-ভেদ দূর করে যার যতোটুকু অধিকার তা নিশ্চিত করাই ইসলামী সাম্যবাদ। ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে ভাই ভাই এবং বন্ধুত্বসুলভ সহযোগিতার মাধ্যমেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত হয়। বৈষম্যের অনুপ্রবেশ রোধে ইসলামী সাম্যবাদ যে অনন্য ভূমিকা রেখেছে তার প্রতি যদি কোন কট্টর ইসলাম বিদ্বেষী মানুষ অতি সাধারণ দৃষ্টিতেও তাকায় নিশ্চয় সে তার পূর্বের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্তি পেতে সমর্থ হবে।

-এস,এম তৌহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম

একাধিক বিবাহ ও হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর আদর্শ

ইসলাম মানব জীবনের পরিপূর্ণ ও উত্তম জীবন বিধানের ধর্ম। ইসলামে এমন কোন বিধান নেই যা মানব জীবনের আপত্তি ও অমঙ্গলের কারণ হতে পারে। তাই শান্তির ধর্ম ইসলামের শরীয়তের বিধানে জীবনের পরিপূর্ণ সুখ ভোগের প্রেক্ষাপটে বিবাহ করা নর-নারীর উভয়ের জন্য ফরয। ইসলামে অবস্থার প্রেক্ষাপটে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান থাকার কারণে বিবাহের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে। তবে নির্ধারিত কারণ ব্যতীত একাধিক বিবাহ করা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মানব রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত রসূল করীম (সঃ) বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে শরীয়ত সম্মতভাবে একাধিক বিবাহ করে সর্বকালের মানব জাতির জন্য এক উজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি (সঃ) কখনো কাম-বাসনা চরিতার্থের জন্য কোন বিবাহ করেন নি। মূলতঃ সমাজের অবহেলিত ও লাঞ্ছিত মহিলাদের অনুরোধে স্ত্রীগণের মধ্যে সম মর্যাদা ও অধিকার এবং ন্যায়-বিচার অক্ষুণ্ন রাখার এক জ্বলন্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য একাধিক বিবাহ করেন। কেননা তাঁর ছিল প্রেমময় খোদাতাআলার সাথে প্রেমসূত্রের সর্বোত্তম সেতু বন্ধনের সম্পর্ক। তাই আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর পরমবন্ধু সম্পর্কে বলেন- আমি তোমাকে [মোহাম্মদ (সঃ)-কে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না (হাদীসে কুদ্‌সী)। আল্লাহ্‌তাআলা আরো বলেন, নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে (৩৩ঃ২২)। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা মানব জাতির উত্তম আদর্শ হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে প্রেরণ করেন। তাই তাঁর জীবনাদর্শই মানব জীবনের উত্তম পাথেয়।

ইসলামের শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কারণে একাধিক বিবাহ করা যায়ঃ

১। কারও স্ত্রী চিররুগ্না হলে এবং সাংসারিক কাজ-কর্মে সম্পূর্ণ অক্ষম হলে দ্বিতীয় বিবাহ করা যায়।

২। স্ত্রী বন্ধা হলে বংশ রক্ষার্থে সন্তান-সন্ততির জন্য একাধিক বিবাহ করা যায়। হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেন- তোমরা একাধিক বিবাহ কর; যেন আমার উম্মত বাড়ে। যাতে আমি অন্যান্য উম্মতের মোকাবেলায় গৌরব লাভ করতে পারি।

৩। যে ব্যক্তি দৈহিক চাহিদার তাড়নায় ও কাম বাসনায় ব্যভিচারে লিপ্ত হবার অবস্থায় পড়ে এবং সে শত চেষ্টার পরও নিজেকে শরীয়তের বিধানে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তখন তার জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করা প্রযোজ্য হয়।

৪। কোন যুদ্ধের সময় অধিক সংখ্যক পুরুষের ক্ষয় হবার কারণে সমাজে নারীর সংখ্যা বেশী হলে এতীম শিশুদের লালন-পালন, বিধবাগণকে ভরণপোষণ এবং সমাজ হতে ব্যভিচার মুক্ত করার জন্য একাধিক বিবাহ জায়েয আছে।

উপরোক্ত কারণ ব্যতীত শুধু কাম সম্ভোগের নেশায়, সমাজে আধিপত্য বিস্তার এবং প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিবাহ ইত্যাদির কারণে একাধিক বিবাহের শিক্ষা ইসলাম দেয় নি। এমনকি সঙ্গত কারণে একাধিক বিবাহের প্রয়োজন হলে স্ত্রীগণের সাথে সমান মর্যাদা ও অধিকার অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে ন্যায়-বিচার বজায় রাখতে না পারলে ইসলাম দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেয় না। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, তুমি দুই, তিন বা চারটি বিবাহ করতে পার কিন্তু যদি সকলের সাথে সমতাপূর্ণ ও সংগত ব্যবহার করতে না পার তবে অবশ্যই একটি (স্বাধীন স্ত্রী) অথবা তোমার যে করায়ত্ত (দাসী) তাকে বিবাহ কর (৪ঃ৪)। কাজেই শরীয়তসম্মত কারণে একাধিক বিবাহ করলে সব স্ত্রীদের ভরণপোষণ, সামাজিকতা ও সহ অবস্থানের সমতা রক্ষার দায়িত্ব স্বামীর উপর। পক্ষান্তরে স্বামীর শরীয়তসম্মত বিবাহ করার প্রয়োজন হলে তাকে বিবাহের পরামর্শ দেয়া এবং সকল সহধর্মীণীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে বসবাস করা স্ত্রীর কর্তব্য। এ প্রসঙ্গেও হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেন - যে সমস্ত স্ত্রীলোক স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে হিংসা না করে ধৈর্য ধারণ করে থাকে আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে শহীদের সমতুল্য পুণ্য দান করবেন। সুতরাং ইসলামের একাধিক বিবাহ প্রথা নারীর মর্যাদাকে হানি করে নি বরং সমাজকে ব্যভিচারমুক্ত, পুরুষের বংশ রক্ষা এক কথায় পারিবারিক জীবনকে অপূর্ব মাধুরীতে ভরে তোলার এক উত্তম ব্যবস্থা করেছে। কেননা বর্ণিত ক্ষেত্রে যদি একাধিক বিবাহের বিধান না থাকত তবে মানুষের উপর অবিচার করা হ'ত।

হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর জীবনার্দশের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় তিনি ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ, ধন-সম্পদ এবং বংশ গৌরবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কোন বিবাহ করেন নি। কারণ লম্পট ও কামুক ব্যক্তি চরিত্রহীন, মিথ্যাবাদী, ভোগ বিলাসী, অত্যাচারী, ধর্ম বিমুখ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে। ইহা বিভিন্ন বিধর্মী বহু বিবাহকারী ব্যক্তিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে দেখা যায়। পক্ষান্তরে বিশ্বস্ততা, ন্যায় নিষ্ঠা, ধৈর্যশীলতা, স্রষ্টার প্রতি নির্ভরশীলতা, সহিষ্ণুতা ও সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি মহৎগুণাবলী হুযূর (সঃ)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সর্বোত্তম ছিল। তাই তিনি (সঃ) স্বয়ং বলেন, আমি মানবীয় চারিত্রিক গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের জন্য আবির্ভূত হয়েছি। তার (সঃ) চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ)-এর চরিত্র ছিল কুরআন (মুসলিম)। সুতরাং হুযূর (সঃ)-এর একাধিক বিবাহের উপর কোন অপবাদ দেয়া অবান্তর, ভিত্তিহীন এবং জঘন্য অপরাধ। কেননা তার জীবন ফুলের মত পবিত্র ছিল।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন ধর্ম ও সামাজিক রীতিতে বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত মহিলাগণের বিবাহ হ'ত না। ফলে বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত মহিলাগণকে আমরা দুর্বিষহ ও অমানবিক জীবন যাপন করতে দেখি। তাই নারী মুক্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠাকারী মহানুভব হযরত রসূল করীম (সঃ) বিধবা তালাক প্রাপ্তা মহিলাগণকে বিবাহ করে তাদেরকে চিরদিনের জন্য সমানভাবে স্ত্রীর অধিকার ও মর্যাদা দিয়ে মানব সমাজে মনুষ্যত্বের আদর্শ কায়েম করেছেন। তিনি প্রধানতঃ নারীত্বের মর্যাদা, প্রেমের বিস্তার, পরিজনবর্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন, অনুরোধ রক্ষা, অসহায়গণের ভরণপোষণ, আদর্শের প্রবণতা সম্পাদন, বিধর্মীদের কন্যা গ্রহণ করে ইসলাম প্রচারের অনুকুল অবস্থা সৃষ্টি, কুসংস্কারের উচ্ছেদ সাধন এবং আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন প্রভৃতি কারণে বহু বিবাহ করেন।

তিনি যে কাম-বাসনা চরিতার্থের জন্য কোন বিবাহ করেন নি, তা উম্মুল মু'মিনীনগণের সাথে তার বৈবাহিক অবস্থা হ'তে প্রতীয়মান হয়। তিনি ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছরের বয়স্কা

বিগত যৌবনা এক বিধবা মহিলা হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)-কে প্রথম বিয়ে করেন। হযরত খদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর অর্থাৎ ৫১ হতে ৬৩ বছরের মধ্যে বাকী বিবাহগুলি করেন। নিম্নের তালিকা হতে তা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হবে ঃ (১) হযরত খদীজাতুল কুবরা (রাঃ) বিধবা, (২) হযরত সাউদা বিনতে জাম'য়া (রাঃ) বিধবা, (৩) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) কুমারী, (৪) হযরত হাফসা বিনতে উমর (রাঃ) বিধবা, (৫) হযরত জয়নাব বিনতে খুজায়মা (রাঃ) বিধবা, (৬) হযরত উম্মী সালমা হিন্দ বিনতে উম্মিয়া (রাঃ)- বিধবা, (৭) হযরত জয়নাব বিনতে জুহাশ (রাঃ) তালাক প্রাপ্তা, (৮) হযরত জুয়ায়রিয়া বিনতে হারিস (রাঃ) বিধবা, (৯) হযরত সুফিয়া বিনতে হুব্বিয়া বিন আখতাব (রাঃ) বিধবা, (১০) হযরত উম্মি হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বিধবা, (১১) উম্মি ইব্রাহীম হযরত মারিয়া কিবতিয়াহ্ (রাঃ) বিধবা, (১২) হযরত মায়মুনা বিনতে হারিস (রাঃ) বিধবা বৃদ্ধা এবং (১৩) হযরত রায়হানা (রাঃ) বিধবা ইহুদীনী। তিনি যে প্রকৃতপক্ষে নিজের নফসানী খায়েশের জন্য কোন বিবাহ করেন নি তা তাঁর জীবনের একটি ঘটনার প্রতি আলোকপাত করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। এক রাতে বিবি আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে হুযূর (সঃ)-এর থাকার পালা ছিল। কিন্তু রাত অতিবাহিত হলে আয়েশা (রাঃ)-এর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি দেখলেন আঁ হযরত (সঃ) গৃহে নেই। তাঁর মনে হ'ল হয়ত তিনি অন্য কোন স্ত্রীর গৃহে গিয়েছেন। তিনি (রাঃ) প্রত্যেক স্ত্রীর গৃহে অনুসন্ধান করলেন। কিন্তু হুযূর (সঃ)-এর সন্ধান পেলেন না। অনেক তালাশের পর দেখলেন হুযূর (সঃ) কবর স্থানে সিজদায় পড়ে কাঁদছেন। তিনি (সঃ) জীবিত ও আকাঙ্ক্ষিত স্ত্রীকে ছেড়ে মৃতগণের কবর স্থানে গিয়ে কাঁদতেছেন। অর্থাৎ স্ত্রীগণের প্রেমে বিভোর না হয়ে খোদার পরম বন্ধু খোদার প্রেমে বিভোর ছিলেন।

আঁ হযরত (সঃ) নিজে যেমন রাতে স্ত্রীগণের সাথে ভোগ বিলাসের পরিবর্তে বেশী সময় ইবাদতে মগ্ন থাকতেন তেমনি স্ত্রীগণকেও ইবাদতের জন্য বেশী তাগিদ দিতেন। তিনি (সঃ) বলেন- আল্লাহ্তাআলা রহম করুন ঐ ব্যক্তির উপর যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং নিজের স্ত্রীকে জাগায়। স্ত্রী যদি গড়িমসি করে তাহলে তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য তার মুখে পানি ছিটায়। তেমনিভাবে আল্লাহ্তাআলা রহম করুন ঐ মহিলার উপর যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং নিজের স্বামীকে জাগায়। স্বামী যদি জাগার ব্যাপারে গড়িমসি করে তাহলে তার মুখ মন্ডলে পানি ছিটায় (আবূ দাউদ)। আমাদের দাম্পত্য জীবনেও এ আদর্শ অনুসরণীয় হওয়া প্রয়োজন।

ইসলামের শিক্ষা তথা হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর জীবনীতে বিধবা ও তালাক প্রাপ্তা মহিলাগণের বিবাহের বিধান থাকা সত্ত্বেও আমাদের মুসলমান সমাজের অনেক নারী পুরুষের মধ্যে তা পালনে অনীহা দেখা যায়। অনেক পুরুষ বিপত্নীক হলেও পুনঃ বিবাহ না করে একাকী ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে থাকেন। ফলে নিসঙ্গ নারী পুরুষগণের যেকোন সময় যৌন উত্তেজনায় ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। কেননা যৌন চাহিদার কল্পনা ও চোখের কু-দৃষ্টিও জিনার অন্তর্ভুক্ত। তাই খোদা প্রদত্ত নেয়ামত দাম্পত্য জীবনের সুখ ভোগের প্রেক্ষাপটে হুযূর (সঃ)-এর আদর্শ অনুসারে বিবাহ করা প্রয়োজন। আল্লাহ্তাআলা বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা বিবধা রয়েছে তাদিগকে বিবাহ কর। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ বর্তমান যুগের ধর্মীয় সংস্কারক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন- কোন স্ত্রীলোকের স্বামী যদি মারা যায় অথচ স্ত্রী যুবতী হয়েও পুনঃ বিবাহকে এমন গর্হিত কাজ মনে করে যেন কোন বড় পাপের কাজ। সারা জীবন সে বিধবা থেকে একাকীত্বের জীবন যাপন করে মনে করে যে, সে বড় পুণ্যের কাজ করেছে। অথচ এমন স্ত্রীলোকের জন্য বৈধব্যের জীবন বড় গুণাহ্র কথা। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন- বিধবা বা তালাক-প্রাপ্ত মহিলা যাদের বিয়ের বয়স আছে তাদের বিয়ে করা উচিত। বিধবা স্ত্রীলোকদের জন্য পুনঃ বিবাহ করা বড়ই পুণ্যের কাজ। এমন স্ত্রীলোক প্রকৃতপক্ষে বড় পুণ্যবতী এবং আল্লাহ্র ওলী যে সমাজের কটূক্তির ভ্রুক্ষেপ না করে পুনঃ বিবাহ করে ঘর সংসার করে (জুমুআর খুৎবা, ১৯শে জানুয়ারী, ২০০১ইং)। সুতরাং জীবনের পরিপূর্ণ সুখভোগের প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একাধিক বিবাহ করা উত্তম। উল্লেখ যে, হযরত রসূল করীম (সঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন বিধায় বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তেরটি বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁর উম্মতে কেহ তাঁর সমতুল্য হতে পারবে না। তাই ইসলাম উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য এক সাথে সর্বোচ্চ চারটি পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে।

পারিবারিক জীবনে হুযূর (সঃ) তার মত স্ত্রীগণের সাথে এমন সুন্দর ব্যবহার করতেন এবং তাদেরকে এত ভালবাসতেন যার তুলনা বিরল। তিনি (সঃ) বলেন- তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম যে স্ত্রীগণের সাথে ব্যবহারে উত্তম। আমি আমার স্ত্রীগণের সাথে উত্তম ব্যবহার করি (তিরমিযী)। হুযূর (সঃ) আরো বলেন- মু'মিনের মধ্যে ঈমানের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা পুর্ণাঙ্গীণ সে, যার আখলাক সর্বাধিক ভাল। আর তোমাদের মধ্যে আখলাকের দিক থেকে সর্বোত্তম সে, যে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম ও আদর্শ ব্যবহার প্রদর্শন করে (তিরমিযী)। হুযূর (সঃ) স্ত্রীগণের সাথে উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ আখলাকের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং এটা আমাদের অনুসরণ করা প্রয়োজন। হুযূর (সঃ) যদিও নিজ বিবিগণের সাথে আপন শক্তি সামর্থ্যানুসারে সমান ব্যবহার করতে কোন ত্রুটি করেন নি তথাপি তিনি (সঃ) আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করতেন, হে খোদা! যা আমার শক্তির মধ্যে তাতে আমি কোন রকম অসমতা করি না। কিন্তু যা আমার ক্ষমতার বাইরে যার (অন্তর) উপর আমার হাত নেই তাতে অনিচ্ছাকৃত অসমতার জন্য আমাকে শাস্তি দিও না (আবূ দাউদ)। এ ব্যাপারে তিনি প্রতিটি স্বামীকে সতর্ক করে বলেন, কোন ব্যক্তির দুই স্ত্রী থাকলে সে যদি তাদের উভয়ের সাথে সম ইনসাফ কায়েম না করে তবে বিচার দিবসে সে তার দেহের অর্ধেক অবশ অবস্থায় উপস্থিত হবে (তিরমিযী)।

হুযূর (সঃ) স্ত্রীগণের প্রহার করা দূরে থাক তাদের সাথে কখনো কর্কশ বাক্যও ব্যবহার করেন নি। তিনি (সঃ) যখন নিজ গৃহে স্ত্রীগণের কাছে যেতেন তখন তাদের সাথে অতি নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করতেন এবং হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় কথা বলতেন (নাসায়ী)।

পক্ষান্তরে তার সহধর্মিণীগণও বিরল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব পারিবারিক জীবনকে স্বর্গসুখে গড়ে তোলার জন্য হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর জীবনাদর্শকে আমাদের জীবনে উত্তম পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গাছ-পালা ও উদ্ভিদের গুরুত্ব

ভুমিকা ঃ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা। পূর্ণাঙ্গ এই দিক থেকেও যে, এর মধ্যে ইহকাল এবং পরকালের করণীয় হিসাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বিদ্যমান। ইসলামের দৃষ্টিতে পরকালের জন্য বেহেশ্‌তী বা জাহান্নামী জীবনের ভিত্তি এই জগতেই স্থাপিত হয়। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যে যেমন বীজ বপন করে, তারই প্রতিফল সে পরকালে পায়। এমন নয় যে, হঠাৎ করে পরকালে সে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে, অথচ এই পৃথিবীতে সে ঈমান ও আমলের বীজ বপন করে যায় নি।

পর্যালোচনা ঃ

আমাদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদ্ভিদ বা বৃক্ষের গুরুত্ব সম্পর্কিত, তাই, সে বিষয়ে দু' একটি কথা বলতে চাই। সূরা ইব্‌রাহীমের ২৫-২৬ আয়াতে ঈমানের বাক্যকে পবিত্র বৃক্ষের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর ঐ বৃক্ষের ৩টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথাও বলা হয়েছে, (১) গভীর শিকড়, (২) সু-বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা এবং (৩) সারা বছর ফলপ্রদানকারী। অন্য দিকে, অপবিত্র বাক্যকে ঐ বৃক্ষের অনুরূপ বলা হয়েছে, যা ভূমি-থেকে উৎপাটিত এবং স্থায়ীত্ব হীন। কুরআন শরীফের বিভিন্ন সূরায় জান্নাতের যে বর্ণনা এসেছে তাতে মনে হয় জান্নাত ফল ও ছায়া প্রদানকারী বিভিন্ন গাছ-পালা সমৃদ্ধ একটি স্থান। বিভিন্ন ফলের মধ্যে আঙ্গুর, বেদানা, খেজুর, কলা, বরই ইত্যাদির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় সূরা ওয়াকিয়া ২৯-৩০ রহমান ৫৩, নাবা ৩৩, সূরা সাফ্‌ফাত ৪২-৪৪ দ্রষ্টব্য। এ সবকেই দৃষ্টান্তের আকারে তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, পরলোকে ঈমানের বাক্য ঐ সকল ফলের আকারে দৃশ্যমান হবে। তদ্রূপ, বেঈমানীর মন্দ বৃক্ষের নাম 'যাক্কুম' রাখা হয়েছে (সূরা সাফ্‌ফাত ৬৩-৬৬) এবং সেটি জাহান্নামের মূল হ'তে উৎপন্ন বলে বলা হয়েছে।

জাতীয় জীবনে বৃক্ষের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে নবীজী (সঃ) বিভিন্ন সময়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, যা হাদীস হিসেবে আজো সসম্মানে স্মরণ করা হয়। যেমন, বৃক্ষরোপণ 'সদকায়ে যারীয়া'স্বরূপ পুণ্যকর্ম। এর থেকে ফল যদি পশু-পাখীরা যায়, এমন কি চোরেও চুরি করে, তার প্রতিদান রোপণকারী পেতে থাকে। নবীজী (সঃ) কোন যুদ্ধ যাত্রার প্রারম্ভে মুসলিম সেনা বাহিনীকে যেসব উপদেশ দিতেন, তার মধ্যে অন্যতম হিসাবে বিধর্মী এলাকার ফলবান বৃক্ষকে না কাটার কথা বলা হতো। তাছাড়া, নবীজী (সঃ) পথের মধ্যে পড়ে থাকা কাঁটা দূর করার কথা বলেছেন এবং ছায়াযুক্ত গাছের নীচে প্রস্রাব পায়খানা করাকে অত্যন্ত দোষণীয় কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই অনেক মুসলমান শাসক যেমন শেরশাহ, বাদশাহ আওরঙ্গজেব রাস্তার ধারে গাছ লাগানোর ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। এতে পরিবেশকে সুন্দর করার সাথে সাথে, ভূমি ক্ষয়রোধ এবং ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে (পাতা, ডাল-পালা, ফল পচে জৈব পদার্থ তৈরীর মাধ্যমে) সহায়ক হতো, যা বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে স্বীকৃত।

অনেক মুনি, ঋষি, সাধক [হযরত বুদ্ধদেব (আঃ) সহ] বৃক্ষ তলে, নীরবে, নিভৃতে সত্যকে উপলব্ধি করার সাধনা করেছেন। হযরত আদম (আঃ)-এর যে জান্নাতের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, মূলতঃ তা ছিল এ ধরনের গাছ-পালা সমৃদ্ধ এক বাগান। (আধুনিক গবেষণায় এটা ইরাকের মেসোপটেমিয়ার নিকটবর্তী কোন স্থান বলে ধারণা করা হয়)। কেননা, মৃত্যুর পরবর্তী যে জান্নাত বা বেহেশ্‌ত, তাতে একবার প্রবিষ্ট হলে আর সেখান থেকে কেউ নির্গত হয় না, এটাই পবিত্র কুরআনের ঘোষণা (সূরা হিজর ঃ ৪৯)।

উপসংহার ঃ

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলাম বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে খুবই ইতিবাচক দৃষ্টি পোষণ করে। তাই আসুন, আমরা প্রত্যেকেই হযরত আদম (আঃ)-এর মত এই পৃথিবীতেই এক জান্নাত রচনা করি, এবং রূহানীভাবে পরকালে ঐ জান্নাতের উত্তরাধিকারী হই, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় (বাকারা ঃ ২৬)। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে এই তওফীক দান করুন, আমীন।

- **অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন**
জিটিআই, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ

আমি কেমন খাদেম হবো ?

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) যুবকদের সম্বোধন করে তাঁর এক নযমে লিখেন, "আমি আমার প্রিয়দের জন্য কখনও ইহা পসন্দ করি না যে, তারা ছোট সফলতাতেই সন্তুষ্ট হবে এবং আকাঙ্ক্ষা হবে নিম্নগামী। ছোট ছোট কথায় বাঘের মত গর্জে উঠবে এবং ছোট খাট ভুল-ত্রুটি দেখলে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে পড়বে। ছোট ছোট আকাঙ্ক্ষাকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে নিবে। ঘরে বসে কথা দ্বারা শত্রুকে (কল্পনাতে) পরাজিত করবে আর যখন কাজের ময়দানে ডাকা হবে তখন ঘাবড়িয়ে যাবে। শিয়ালের মত অপেক্ষায় থাকবে ও স্বপ্ন দেখবে বাঘের শিকারকৃত জীব-জন্তুর উদ্বৃত্ত খাবারের জন্য। হে আমার আদর পাবার প্রত্যাশী, ইহা হলো আমার মনোবাসনা। যদি তোমার আকাঙ্ক্ষা খাটো ও তোমার উদ্যম মৃত, সাহস অল্প এবং তোমার চিন্তা ভাবনা বিশৃংখল হয় তাহলে তোমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমি নীচ হয়ে যাবো? আমি তো জান্নাতের মিনার, তাহলে তোমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কি আমি দোযখের সিঁড়ি হয়ে যাবো? আমার মন বাসনা এরূপ, তুমি তোমার দৃষ্টিকে উঁচু করো। তকদীরের জালে আবদ্ধ না হয়ে তকদীরকে নিজের মুঠোয় নিয়ে নাও। আমি খোদার প্রেমিক ও খোদাই আমার প্রিয়। যদি তুমি অনন্য হও তাহলে তুমিও আমার নয়ণমণি হবে। তুমি সমগ্র পৃথিবীকে দাও কিন্তু তোমার হাত যেন ভিক্ষা না নেয়।"

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর উপরোক্ত আকাঙ্ক্ষার আলোকে খোদ্দামের গড়ে উঠা উচিত।

ইজতেমা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

আগামী ২৪, ২৫ ও ২৬ অক্টোবর রোজ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৩০তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা ৪নং বকশী বাজারস্থ দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্‌। উক্ত ইজতেমায় সকল খাদেম ও তিফলকে অংশ নেয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এবং ইজতেমার সফলতা ও নিরাপত্তার জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে। পাশাপাশি খোদ্দাম ও আতফাল যাতে করে এ মহতী আয়োজনে অংশগ্রহণ করে সেই লক্ষ্যে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য অভিভাবকদেরকেও অনুরোধ করা হ'ল।

- **মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ**
সদর, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

ময়মনসিংহ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রথম বার্ষিক ইজতেমা

গত ২৫/৮/০১ ইং তারিখ শনিবার ময়মনসিংহ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রথম বার্ষিক ইজতেমা স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট মিসেস লুৎফা আহমদের বাসভবন 'জামান ভিলাতে' সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। সংগঠনের দু'টি হালকা নেত্রকোনা ও সোহাগী এতে অংশগ্রহণ করে। কেন্দ্র হতে বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহর সদর, মিসেস মাকসুদা রহমান এবং সেক্রেটারী মাল মিসেস মরিয়ম সুলতানা যোগদান করেন। ৭জন যেরে-তবলীগ মেহমানসহ লাজনা ও নাসেরাত মিলে মোট ৩৩ জন এতে উপস্থিত ছিলেন। একদিনের ইজতেমা দু'টি অধিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন ঃ সদর সাহেবা। তার বক্তব্য বিষয় ছিল আহমদীয়া জামাতের পরিচিতি, এর উদ্দেশ্য, কর্মকান্ড ও নেযামের এতায়াত। এরপর তিনি যেরে-তবলীগ মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। মালী কুরবানী ও জামাতের চাঁদা প্রদান প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন সেক্রেটারী মাল বা.লা.ই. মিসেস মরিয়ম সুলতানা। লাজনা ও নাসেরাতদের স্বাগত জানিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক মূল্যবান বক্তব্য রাখেন মোহতরম আজহার আলী খান সাহেব, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ময়মনসিংহ।

ইজতেমা উপলক্ষ্যে পূর্বেই লাজনা ও নাসেরাতে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত কুরআন তেলাওয়াত ও নযম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন স্থানীয় জামাতের মোয়াল্লেম মৌঃ আবুল খায়ের সাহেব। ইজতেমার দ্বিতীয় অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানের কুইজ প্রতিযোগিতা। বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ইজতেমার নিরাপত্তা সহ সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করেন এখানকার খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ, নায়েব কায়েদ ও অন্যান্য খোদ্দাম। আল্লাহ্‌তাআলা তাদের যাযায়ে খায়ের দান করুন, আমীন।

লাজনা প্রতিনিধি
পাক্ষিক আহমদী

মাহিগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র দ্বিতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে অত্যন্ত আনন্দঘন ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ মাহিগঞ্জের দ্বিতীয় বার্ষিক ইজতেমা গত ২৬ ও ২৭ জুলাই রোজ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার মাহিগঞ্জ মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার বাদ যোহর থেকে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয় এবং শুক্রবার বাদ আসর ইজতেমার কার্যক্রম শেষ হয়। এই ইজতেমায় উত্তর জোন এর আহবায়ক জনাব বশিরুর রহমান, সদর মুরব্বী, রংপুর জামাতের মোয়াল্লেম কামরুল ইসলাম প্রধান এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম দাউদ আহমদ বোখারী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ইজতেমায় স্থানীয় লাজনা এবং নাসেরাত ১০০ জন এরও অধিক পরিমাণ সদস্যা অংশ গ্রহণ করেন।

- হাজেরা খাতুন, প্রেসিডেন্ট
লাজনা ইমাইল্লাহ্‌, মাহিগঞ্জ, রংপুর

ময়মনসিংহে মজলিস আনসারুল্লাহর কার্যক্রম

গত ২৪শে আগষ্ট, ২০০১ইং রোজ শুক্রবার মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌, বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে খাকসার ময়মনসিংহ সফর সম্পন্ন করি। উল্লেখ্য যে, জার্মানীর আন্তর্জাতিক সালানা জলসা উপলক্ষ্যে জামাতের ময়মনসিংহ ও নও মোবায়েঈন ও জেরে তবলীগ সহ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যাদের স্থানীয় ইজতেমা উপলক্ষ্যে কেন্দ্র থেকে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ বাংলাদেশের সদর সাহেবা মোহতারেমা মাকসুদা রহমান ও সেক্রেটারী ফাইনান্স মিসেস মরিয়ম সুলতানা ময়মনসিংহ সফর করেন। সেখানে ২৫শে আগষ্ট তারিখে লাজনার ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

২৪/২/২০০১ শুক্রবার বাদ নামায জুমুআ আকুয়াস্থ মসজিদে সকল আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও নাসেরাতের উপস্থিতিতে এক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সর্বমোট উপস্থিতির সংখ্যা ৫০ জনের অধিক ছিল। মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র স্থানীয় যয়ীম অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেবের সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে সভা আরম্ভ হয়। অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেব তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন যে, এক কালে ময়মনসিংহ জামাতের কাজে-কর্মে তবলীগে খুব সুনাম ছিল। কালের গর্ভে সেই ঐতিহ্য ও কর্ম তৎপরতা একটু স্থবির হয়ে গেছে। তিনি সকলের নিকট সেই হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কেন্দ্র থেকে আগত সম্মানিত অতিথির দিক-নির্দেশনা নিয়ে পুনঃ জাগরণ সৃষ্টি করার আহ্বান জানান।

এরপর খাকসার উপস্থিত সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর খেদমতে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও সালাম পেশ করি। সকল অঙ্গ সংগঠন সহ জামাতি কর্ম-কান্ডে নিজেদের খেদমত, সময় ও মাল কুরবানী করার আবেদন জানানো হয়। তালীম, তরবিয়ত, তবলীগ ও পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করার আহ্বান জানানো হয়। সাথে সাথে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় কর্ম-কর্তা ও সাধারণ সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। কাজে-কর্মে পূর্বে যে-সব দুর্বলতা ও শিথিলতা, অবহেলা বা গাফলতি ছিল তা এখন থেকে দূর করে নূতন উদ্যোগে মজলিস এবং জামাতি কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। কেন্দ্রের সাথে নিয়মিত সংযোগ বৃদ্ধির আবেদন করা হয়। মাসিক রিপোর্ট, তাজনীদ, বাজেট, চাঁদা আদায় ও কেন্দ্রে প্রেরণ এবং কেন্দ্রীয় তালীমী পরীক্ষায় সকলের অংশগ্রহণ করার উপর তাগিদ দেওয়া হয়। তারপর স্থানীয় জামাতের বর্তমান প্রেসিডেন্ট অধ্যক্ষ আজহার খান সাহেব শুকরিয়া ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। তিনি তার বক্তৃতার এক পর্যায়ে বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের খেদমতে জামাতের অতীত ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত করেন। জামাতের গত হয়ে যাওয়া কয়েকজন বিশিষ্ট মোজাহিদ ও একনিষ্ঠ নিবেদিত কর্মীর জামাতের প্রতি আনুগত্য ও কুরবানীর কথা স্মরণ করিয়ে সকলকে অনুপ্রাণিত করে তার বক্তব্য শেষ করেন। সবশেষে খাকসারের পরিচালনায় দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

সভাশেষে প্রেসিডেন্ট সাহেবের ছেলের নতুন চাকুরী লাভের আনন্দে শুকরিয়া জ্ঞাপনাথে উপস্থিত সকলকে মিষ্টি মুখে আপ্যায়ন করা হয়। উল্লেখ্য, সভায় স্থানীয় মোয়াল্লেম হাফেয আবুল খায়ের সাহেব ও ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর, জামালপুর অঞ্চলের রিজিওনাল নাযেম ডাঃ মোজাহিদ উদ্দিন সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

দিনাজপুর ও রংপুর

গত ২১শে আগষ্ট রোজ মঙ্গলবার সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রথমে দিনাজপুর ও পরে রংপুর জামাতে সফর করা হয় ও জামাতের খোঁজ - খবর নেওয়া হয়।

শফিক আহমদ
নায়েব সদর সফে দওম
মজলিস আনসারুল্লাহ্‌, বাংলাদেশ

সংবাদ

কৃতী ফুটবল খেলোয়ার ইব্রাহীম

হল্যান্ড নিবাসী জনাব কাওসার আহমদ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইব্রাহীম আহমদ (১২ বৎসর) এখানকার একটি বিখ্যাত প্রফেশনাল ফুটবল টীমে (RKC Waalwyk) খেলার সুযোগ পেয়েছে।

বহু খেলোয়ারদের মধ্য থেকে বাছাইকৃত খেলোয়ারদের নিয়ে এই যুব ফুটবল টীমকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সেই সাথে স্কুলের পড়াশুনায়ও ভাল ফলাফল করতে হচ্ছে।

ইব্রাহীম ইতোমধ্যে হল্যান্ড, জার্মানী, বেলজিয়াম, ইটালী ও সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন নামী-দামী ফুটবল টীমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশ নিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

আগামী ১লা আগস্ট জাপানের একটি ফুটবল টীমের সাথেও একটি ম্যাচ খেলতে হবে।

হুযূর (আইঃ) ও ইব্রাহীমের এই সফলতায় খুব খুশী হয়ে দোয়া করেছেন।

ইব্রাহীমের উত্তরোত্তর উন্নতি এবং এ উন্নতি যেন জামাতের সুনাম বৃদ্ধি ও তবলীগের সহায়ক হয় তার জন্য সবার কাছে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

- **কাওসার আহমদ**
বাংলাডেস্ক, হল্যান্ড

সুন্দরবনে সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনে গত ২৪/০৭/২০০১ ছোট ভেটখালী হালকা, ২৫/০৭/২০০১ মুন্সিগঞ্জ হালকা, ২৯/০৭/২০০১ পার্শ্বেখালী হালকা, ৩০/০৭/২০০১ইং হরিনগর হালকা ও ৩১/০৭/২০০১ মীরগাং হালকাতে সাফল্যের সাথে মহান সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসার আয়োজন করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা রাখেন সর্বজনাব শেখ মাহফুজুর রহমান সেক্রেটারী তবলীগ, আহমদ আলী মোল্যা, সেক্রেটারী অডিও/ভিডিও, এম জিল্লুর রহমান, সেক্রেটারী, মহাসচিব, শেখ বাবলুর রহমান, মোয়াল্লেম, এনামুল হক (রনি), মোয়াল্লেম ও শেখ আলম, দেহাতী মোয়াল্লেম প্রমূখ। অনুষ্ঠানে আহমদী ও অ-আহমদী ভ্রাতাগণ উপস্থিত ছিলেন। মাইক যোগে অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

- **শেখ মাহফুজুর রহমান (মুকুল)**
সেক্রেটারী তবলীগ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন

বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন

গত ১৩-৭-২০০১ হতে ২০-৭-২০০১পর্যন্ত বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন করে। স্থানীয় আমীর জি. এম. মতিউর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত মোহতামীম মাল জনাব লুৎফর রহমান সাহেব দু'টি বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৪৬ জন খাদেম ৫২ জন তিফল এবং ২১ জন আনসার উপস্থিত হয়। সপ্তাহ ব্যাপী কর্মসূচীর মধ্যে ছিল (১) বৃক্ষরোপণ, (২) বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য বেড়া তৈরী, (৩) পূর্বে রোপিত বৃক্ষগুলির পরিচর্যা ইত্যাদি। সর্ব মোট ৫৯টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

এস. এম. তারিকুল ইসলাম, নায়েম ইশায়াত
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, সুন্দরবন

গ্রুপ ফটোতে বাঁ দিক থেকে ৩য় দাঁড়ানো অবস্থায় ইব্রাহীমকে দেখা যাচ্ছে। Rotterdam-এর ফুটবল টীম ফাইনুর্ড ক্লাবের স্টেডিয়ামে (কাইপ) ২০০০ সনে ঐ ক্লাবেরই যুব টীমের বিরুদ্ধে খেলার পরই এই ছবি তোলা হয়। একই স্টেডিয়ামে গত বছর ইউরোপিয়ান কাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলাটিও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। (France বনাম Itali)

শুভ বিবাহ

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে গত ২৯.০৮.২০০১ইং রোজ বুধবার বাদ মাগরিব আমার মেঝ কন্যা মোসাম্মৎ রশিদা কানেতা (রোজী) এম, এ -এর সাথে রাজশাহী নিবাসী প্রফেসর ডঃ তারিক সাইফুল ইসলাম সাহেব নায়েব ন্যাশনাল আমীর ১ম-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক এম, এস, সি-এর ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা মাত্র মহরানা ধার্যে বিবাহের এলান করা হয়। বিবাহের এলান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুরব্বী সিলসিলাহ্। এ বিবাহ্ যাতে সার্বিকভাবে কল্যাণ-মন্ডিত হয় তার জন্য জামাতের সকলের কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন করছি।

- **আব্দুল আযীয সাদেক**, মুরব্বী সিলসিলাহ্

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD
CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212
Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ

রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮২৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য
যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ
৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 64 ❑ 4th Issue August 31, 2001 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

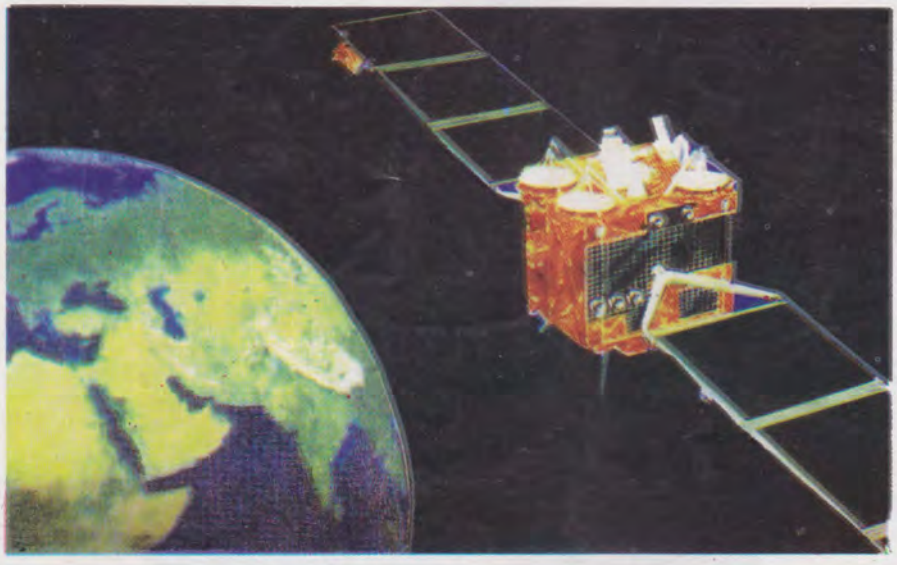

لا اله الا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ MTA-এর দর্শকদের জন্য সুখবর!

এমটিএ **MTA** আন্তর্জাতিক স্যাটালাইট টেলিভিশন প্রযুক্তি আর উৎকর্ষের পথে আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে। এশিয়ার দর্শকদের জন্য গত ১৩ই মার্চ, ২০০১ থেকে এম টি এ ডিজিটাল সম্প্রচার আরম্ভ করেছে (আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌)। এর পাশাপাশি এনালগ সম্প্রচার আগের মতই আগামী কয়েকমাস চালু থাকবে। তাই দর্শকদের কাছে ডিজিটাল সিস্টেমে যাবার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে আছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। DIGITAL সম্প্রচার ধারণ করতে আপনার কেবল একটি নতুন DIGITAL RECIEVER SET লাগবে। DISH আর LNB অপরিবর্তীত থাকবে। নতুন RECIEVER-এর মূল্য প্রায় এগার হাজার টাকা পড়বে।

আকাশে এমটিএ-এর নতুন ঠিকানা ঃ

MTA INTERNATIONAL (DIGITAL)
SATTELLITE : ASIASAT 2
POSITION : 100.5^0 EAST
SYMBOL RATE : 27500
DOWN LINK FREQ : 3660 MHZ
POLARITY : VERTICAL
PID : AUTO & OTHER NOS.
FEC : 3/4

ডিজিটালে দশ ফিট ডিশে অত্যন্ত স্বচ্ছ আর স্পষ্ট ছবি ও শব্দ ধারণ করা যায়। একই FREQUENCY -তে সউদী টিভি চ্যানেল 'ওয়ান' ধরা হয়। সমস্ত কেবল টিভি ব্যবসায়ীরা এই স্যাটেলাইট ধরে থাকেন।

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	:	6.50 MHz
* English	:	7.02 MHz
* Arabic	:	7.20 MHz
* Bangla	:	7.38 MHz
* French	:	7.56 MHz
* German	:	7.74 MHz
* Indonesian	:	7.92 MHz
* Turkee	:	8.10 MHz

MTA-তে প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষাভাষী দর্শক - শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন আহবান করা যাচ্ছে। নিম্ন ঠিকানায় প্রশ্ন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

প্রতিটি ঘরে এমটিএ-এর সংযোগ নিন এবং নিয়মিত অনুষ্ঠান মালা দেখুন। পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯ ফ্যাক্স ঃ ৭৩০০৯২৫
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 7300925 E-mail : amgb@bol-online.com